Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলাম ধর্ম সমাজ সংস্কৃতি

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

হুমায়রা আসমা

রোলঃ 23090121157

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলাম ধর্ম সমাজ সংস্কৃতি

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

হুমায়রা আসমা

রোলঃ 23090121157

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইসলাম ধর্ম সমাজ সংস্কৃতি " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে হুমায়রা আসমা, আইডিঃ 23090121157 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলাম ধর্ম সমাজ সংস্কৃতি " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

হুমায়রা আসমা

আইডিঃ 23090121157

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 6
প্রথম অধ্যায় 9
আকায়েদ 9
ইসলামের অর্থ, মর্ম ও সীমারেখা 9
ইসলামে 'আকীদার গুরুত্ব 11
মৌলিক ইসলামী আকীদাসমূহ...... 12
দ্বিতীয় অধ্যায় 15
ইবাদত 15
সালাত (নামায):...... 15
আযান ও এর অর্থ 17
আযান: সালাতের আহ্বান ও ইসলামের ঘোষণা 18
পাক-পবিত্রতা ও ওযু...... 19
যাকাত...... 20
ইসলামে যাকাতের গুরুত্ব ও শরঈ মর্যাদা...... 20
যাকাত কিসের ওপর ওয়াজিব 22
সিয়াম 23
সিয়ামের হুকুম ও এতদসম্পর্কিত আয়াত 23
ইবাদতের বিশ্বব্যাপী মৌসুম এবং নেক আমলের সাধারণ উৎসব 28
সিয়ামের রূহ ও হাকীকতের হিফাজত...... 29
ই‘তিকাফ : হুকুম, উদ্দেশ্য ও فضائل 33
লায়লাতুল কদর (শবে কদর) 36

হজ্জ 38

কুরআন মজীদে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কাহিনী এবং "বালাদুল আমীন" (মক্কা)-এর সঙ্গে এর সম্পর্ক..39

হজ্জ ইবরাহীম (আ)-এর আমল ও সিফতের স্মারক এবং তাঁর দাওয়াত ও তা'লীমের নবায়ন 40

ইতিহাসের নতুন শিরোনাম, মানবতার সীমারেখা..41

মানবতার আশ্রয় 42

হজ্জের মূল আনুষঙ্গিক কাজ..43

তৃতীয় অধ্যায় মুসলমানদের কতিপয় জাতীয় ও ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য 45

১ম বৈশিষ্ট্যঃ আকীদা এবং স্থায়ী দীন ও শরীয়ত 45

২য় বৈশিষ্ট্যঃ পবিত্রতার সুনির্দিষ্ট ধারণা ও ব্যবস্থা 46

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য: খাদ্য ব্যবস্থা (আহার্য ও পানীয়) কুরআনী নির্দেশের অধীন..................47

৪র্থ বৈশিষ্ট্যঃ নবী (সা.) ও কুরআনের প্রতি ভালবাসা..48

পঞ্চম বৈশিষ্ট্য: বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্বের সঙ্গে সংযোগ ও সম্পর্ক..................................49

৪র্থ অধ্যায় মুসলমানদের সমাজ ও সামাজিকতা..50

শিশুর জন্ম ও আকীকা 50

পাক-পবিত্রতার তা'লীম 51

সালাতের শিক্ষা ও তালকীন..51

ইসলামী আদব-কায়দা 52

বিয়ের মাহাত্ম্য ও দাম্পত্য জীবনের ইসলামী নির্দেশনা..53

মৃত্যু ও জানাযা: ইসলামের দৃষ্টিকোণ 56

শোকসন্তপ্ত পরিবারের জন্য খাবার প্রেরণ ও শোকে অংশগ্রহণ..................................59

৫ম অধ্যায় ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতি 60

ইবরাহিমী-মুহাম্মদী সভ্যতা..60

ইবরাহিম। সভ্যতার তিনটি বৈশিষ্ট্য..........61
প্রথম বৈশিষ্ট্য: মুসলমানের জীবনে আল্লাহর স্মরণ..........62
দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য: তৌহিদী আকীদা..........63
তৃতীয় বৈশিষ্ট্য: মানবীয় মর্যাদা ও সাম্যের ধারণা..........64
ছোটখাটো ও খুটিনাটি বৈশিষ্ট্য..........65
মুসলিম সমাজে পেশার অবস্থানগত মর্যাদা..........66
বিধবা ও ডিভোর্সি নারীর পুনর্বিবাহ..........67
সালামের রেওয়াজ ও তার বিভিন্ন প্রকার..........68
ইসলামে 'ইলম' (জ্ঞান)-এর মর্যাদা..........69
উপসংহার..........73

পূর্বকথা

ইসলাম আল্লাহপ্রদত্ত একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা, যা শুধু ইবাদত নয়—মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক, নৈতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সব ক্ষেত্রের সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান করে। যুগের পরিবর্তন, বিদেশি সংস্কৃতির প্রভাব এবং বিভিন্ন মতাদর্শের সংঘর্ষের কারণে মানুষের কাছে ইসলামের প্রকৃত রূপ অনেক সময় অস্পষ্ট হয়ে পড়ে। অনেকে ব্যক্তিগত প্রবণতা, দর্শন, রাজনীতি বা আধ্যাত্মিকতার প্রভাব নিয়ে ইসলামকে ব্যাখ্যা করেন, যার ফলে ইসলামের সামগ্রিক ভারসাম্যপূর্ণ পরিচয় অনেক ক্ষেত্রেই হারিয়ে যায়।

এমন সময়ে ইসলামের মূল ধারণা, উদ্দেশ্য, আদর্শ ও বাস্তবপ্রয়োগযোগ্য দিকগুলো স্পষ্টভাবে তুলে ধরা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ইসলামের সঠিক পরিচয়কে সহজ ভাষায়, যুক্তিযুক্তভাবে এবং জীবনব্যবস্থার সামগ্রিক রূপসহ উপস্থাপন করা—এই গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য। এই কাজের মাধ্যমে পাঠক ইসলামের প্রকৃত সৌন্দর্য, পরিপূর্ণতা এবং মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এর উপযোগিতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন—এই প্রত্যাশা করি।

—

গুজারি

ইসলামের প্রকৃত পরিচয় ও তাৎপর্য বোঝাতে বহু লেখক বহু গবেষণা ও রচনা করেছেন। তাদের শ্রম ও সময়ের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। তবুও, এমন একটি সংক্ষিপ্ত, সংহত ও ভারসাম্যপূর্ণ রচনা আজও প্রয়োজন, যা পাঠকের কাছে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, নৈতিকতা এবং সামাজিক নির্দেশনাগুলো সহজভাবে তুলে ধরতে পারে। কারণ অনেক মুসলিম এখনও ইসলামের মৌলিক ধারণা এবং এর বাস্তব প্রয়োগ সম্পর্কে যথাযথভাবে অবগত নয়।

এই রচনার মাধ্যমে আমি পাঠককে ইসলামের মৌলিক উদ্দেশ্য, নৈতিকতা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক নির্দেশনা এবং পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শনের ধারণা স্পষ্টভাবে বোঝাতে চাই। সংকলনের

সময় আমরা সর্বদা নির্ভরযোগ্য এবং স্বীকৃত ইসলামী উৎসকে মান্য করেছি, যাতে তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও ভারসাম্য বজায় থাকে।

ভূমিকা

ইসলাম এমন একটি ঐশ্বরিক জীবনব্যবস্থা, যা মানুষের আত্মা, চরিত্র, সমাজ, সংস্কৃতি, রাষ্ট্র—জীবনের প্রতিটি পর্বকে আলোকিত করে। আল্লাহ তাআলা মানুষকে উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করেননি; বরং সঠিক পথ দেখানোর জন্য পাঠিয়েছেন কুরআন এবং নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর সুন্নাহ। আল্লাহ বলেন—

﴿إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য একমাত্র দ্বীন হলো ইসলাম।"

) সূরা আলে ইমরান: **১৯**(

ইসলাম শুধু কিছু আচার বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়; বরং এটি বিশ্বাস, ইবাদত, নৈতিকতা, সংস্কৃতি, সামাজিকতা ও মানবিকতার একটি পূর্ণাঙ্গ কাঠামো। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন—

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾

"আমি জিন ও মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছি শুধুই ইবাদতের জন্য।"

(সূরা আয-যারিয়াত: ৫৬)

অর্থাৎ মানুষের জীবনের কেন্দ্রবিন্দু হলো ইবাদত, আর ইবাদতের মাধ্যমেই আকীদা-ইমান দৃঢ় হয়, চরিত্র পরিশুদ্ধ হয়, সমাজে ন্যায়-সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইসলামের আকীদা সম্পূর্ণভাবে তাওহিদভিত্তিক। আল্লাহ বলেন—

﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ﴾

"জেনে রাখ—আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই।"

(সূরা মুহাম্মদ: ১৯)

এই তাওহিদই মুসলমানকে শির্ক, কুসংস্কার ও ভুল বিশ্বাস থেকে মুক্ত করে সোজা পথে পরিচালিত করে।

ইবাদতের ক্ষেত্রেও ইসলাম দৃঢ়, সুস্পষ্ট ও সুন্দর বিধান দিয়েছে—সালাত, যাকাত, সিয়াম, হজ্জ। সালাত সম্পর্কে আল্লাহ বলেন—

﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ﴾

“নিশ্চয়ই সালাত অশ্লীলতা ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।”
(সূরা আল-আনকাবুত: ৪৫)

যাকাত সমাজের ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান দূর করে, সিয়াম মানুষকে তাকওয়ার পথে নিয়ে যায়, আর হজ্জ মুসলিম উম্মাহর ঐক্য, ইতিহাস ও আত্মিক বিশুদ্ধতার প্রতীক। রাসূল ﷺ বলেছেন—
“ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত।”
(বুখারি ও মুসলিম)

ইসলাম শুধু ব্যক্তিগত আমল নয়—সমাজ ও সংস্কৃতি নির্মাণেও অত্যন্ত সমৃদ্ধ। পরিবার গঠন, শিশুপালন, প্রতিবেশীর অধিকার, সালাম, অতিথি আপ্যায়ন, দাম্পত্য জীবন, উত্তরাধিকার—এসব ক্ষেত্রে ইসলামের শিক্ষা দুনিয়ার যেকোনো সভ্যতার চেয়ে বাস্তব ও পরিপূর্ণ।

মুসলিম সভ্যতা মূলত তাওহিদ, জ্ঞান, নৈতিকতা ও মানবিকতার ওপর দাঁড়ানো। আল্লাহ বলেন—

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾

“আমি অবশ্যই আদম সন্তানকে মর্যাদাবান করেছি।”
)সূরা আল-ইসরা: ৭০(

এই আয়াতই ইসলামি সভ্যতার মূলমন্ত্র—মানুষের মর্যাদা সর্বোচ্চ।

নৈতিকতার ক্ষেত্রে আল্লাহর রাসূল ﷺ মানবতার সর্বোত্তম আদর্শ। আল্লাহ তাঁর সম্পর্কে বলেন

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾

“নিশ্চয়ই তুমি উত্তম চরিত্রের সর্বোচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত।”
)সূরা আল-কলম: ৪(

“এই গবেষণাপত্রে ‘ইসলাম: ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি’ বিষয়ক আকীদা, ইবাদত, নৈতিকতা, সভ্যতা ও সামাজিক বৈশিষ্ট্যের বিভিন্ন মাত্রা কুরআন-হাদীস, ইসলামী সাহিত্য ও প্রামাণ্য গবেষণার আলোকে বিশ্লেষণধর্মী পদ্ধতিতে উপস্থাপন করা হয়েছে—যাতে পাঠক ইসলামী জীবনব্যবস্থার সমগ্রতা, সাম্য ও মানবিক মর্মবোধকে সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পারেন।”

প্রথম অধ্যায়

আকায়েদ

ইসলামের অর্থ, মর্ম ও সীমারেখা

ইসলাম শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো— সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ, অনুগত হওয়া এবং শান্তি স্থাপন করা। ইসলামের প্রকৃত মর্ম হলো আল্লাহর প্রতি নিখাদ আনুগত্য এবং তাঁর বিধানকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে গ্রহণ করা। ইসলাম কোনো আংশিক বা খণ্ডিত জীবনব্যবস্থা নয়; বরং মানুষের ব্যক্তিগত জীবন, পরিবার, সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, নৈতিকতা—সবকিছুই আল্লাহ প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে পরিচালিত হওয়াকে ইসলাম বলে।

কুরআনের আলোকে ইসলামের প্রকৃত সীমানা

আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَاتِهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

"মু'মিনগণ! তোমরা ইসলামে পরিপূর্ণরূপে দাখিল হও। আর তোমরা শয়তানের অনুসরণ করোনা। সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।"

(সূরা বাকারা, ২০৮ আয়াত;)

এখানে সংরক্ষণ নেই, রিজার্ভেশন নেই যে, এতটা আপনার আর এতখানি আমার, এতটা দেশের আর এতটা সরকারের, এতটা আল্লাহর আর এতটা বংশ, গোত্র ও খান্দানের, এতটা দীন ও মিল্লাতের আর এতটা রাজনৈতিক স্বার্থের জন্য নিবেদিত। না, এমন নয়; এখানে যা কিছু তার সবটাই আল্লাহর। এখানে সব কিছুই ইবাদত আর ইবাদত।

মুসলমানের গোটা জীবনটাই আল্লাহর সামনে বিনীত ভৃত্যের ন্যায়। দীনের গণ্ডি ও সীমারেখা গোটা জীবনকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। এতে কোন প্রকার কাটছাঁট করবার কারুর কোন

অধিকার নেই। বড় বড় মুজতাহিদ ও সমকালীন ইমামেরও অনুমতি নেই কুরআন মজীদের সুস্পষ্ট ও অকাট্য বিধানের একটি শব্দ, একটি বিন্দুমাত্র পরিবর্তনের।
আল্লাহ দাবি করেন, ইসলাম দাবি করে যে, ইসলামে তোমরা পরিপূর্ণরূপে প্রবেশ কর। আমি পরিষ্কারভাবে বলছি এবং পরিষ্কারভাবে বলা আমি আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য মনে করি যে, আমাদের মুসলমানদের উঠা-বসা, চলাফেরা,.. পানাহার ও সামাজিক আদান-প্রদান, বিয়ে-শাদীর তরীকা, উত্তরাধিকারের পন্থা-পদ্ধতি, মুসলমানদের লেনদেন শরীয়ত থেকে দূরে, অনেক দূরে। কিছু -লোক তো এমন আছে যারা আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে দীনের পাবন্দ। আলহামদুলিল্লাহ। তওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদ সম্পর্কে তাদের মস্তিষ্ক সাফ-সুতরা। রিসালত ও নবুওত সম্পর্কে, পরকাল সম্পর্কে যেসব 'আকীদা-বিশ্বাস রয়েছে সে সম্পর্কে তাদের দিল বড্ড পরিষ্কার। কিন্তু ইবাদতের ক্ষেত্রে তারা বড় কাঁচা। এমন অনেককে পাওয়া যাবে যারা আকীদা-বিশ্বাস ও ইবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে পাকাপোক্ত, কিন্তু লেনদেনের ক্ষেত্রে ও আখলাক-চরিত্রের ব্যাপারে তাদের কথা না বলাই ভাল। লেনদেন ও আখলাকের ক্ষেত্রে তারা আদৌ নির্ভরযোগ্য নয়। লেনদেনের ব্যাপার ঘটলে দেখা যাবে খেয়ানত করে বসেছে। মাপজোখের বেলায় কম দেবে। ব্যবসা-বাণিজ্য করবে, কিন্তু ব্যবসা যদি শরীকানা হয়, অংশীদারী কারবার হয় তবে এতে সে বেইনসাফী করবে, শরীকের হক মেরে বসবে। পাড়া-প্রতিবেশী কষ্ট পাবে তার থেকে।

অথচ হাদীসে বলা হয়েছেঃ

"মুসলমান সে-ই যার মুখ ও হাত (-এর কষ্ট) থেকে অপর মুসলমান নিরাপদ থাকে।"

"তোমাদের কেউ মুসলমান হতে পারবে না যতক্ষণ না তার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ হবে।"

মুসলমানের ভেতর এমন একটা শ্রেণী আছে যাদের কথা না বলাই ভাল। তারা লেনদেন ও আখলাক-চরিত্রকে দীন থেকে বহিষ্কৃত করে রেখেছে। একে তারা ধর্ম বহির্ভূত মনে করে। তারা মনে করে যে, ব্যস! 'আকীদা-বিশ্বাস ঠিক থাকলেই হল আর ইবাদত-বন্দেগী (ইবাদত-বন্দেগীকে তারা নামায রোযা ও হজ্ব পালন পর্যন্ত সীমিত রাখে) করলেই হল। তারা না লেনদেনের ব্যাপারে পরিষ্কার, না ওয়াদা রক্ষার ব্যাপারে যত্নবান। আমানত রক্ষার ব্যাপারে

তাদের যেমন মাথা ব্যথা নেই, তেমনি ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক বণ্টনেরও তাদের বালাই নেই। এগুলোর কোন গুরুত্বই নেই তাদের কাছে। হুকুকু'ল-ইবাদ তথা মানুষের অধিকার রক্ষা তাদের নিকট কোন গুরুত্ব বহন করে না। আত্মীয়-স্বজন ও হকদারের হক সম্পর্কে তারা বেপরওয়া, একেবারে মুক্ত, স্বাধীন। মানুষের সাথে লেনদেনে ও ব্যবসা-বাণিজ্যে যেমন, তেমনি জীবনের অপরাপর ক্ষেত্রেও নিজেদের মর্জি মাফিক ও খেয়াল-খুশিমত তারা কাজ করে।

মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যেসব মুসলমান নিজের হাতে গড়েছিলেন তাঁরা ছিলেন সাহাবায়ে কিরাম (রা)। তাঁরা ছিলেন দীনের পূর্ণ অনুসারী ও অনুগত। তাঁদেরকে দীনের ছাঁচে ঢালাই করা হয়েছিল। তাঁদের আকীদা-বিশ্বাস, তাঁদের ইবাদত-বন্দেগী, লেনদেন, আখলাক-চরিত্র, প্রথা-পদ্ধতি, অনুষ্ঠানমালা, তাঁদের বিজয়, হুকুমত ও সাম্রাজ্য পরিচালনার পদ্ধতি সব কিছুই এবং তাদের জীবনের সকল শাখাই শরীয়ত মুতাবিক ছিল।

ইসলামে 'আকীদার গুরুত্ব

ইসলামের পুরো কাঠামোর ভিত্তি দাঁড়িয়ে আছে শুদ্ধ বিশ্বাস বা আকীদার ওপর। ঈমান ঠিক না হলে ইবাদত যতই বিশদ হোক, তা আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য হয় না। কারণ ইবাদতের মূল্যায়ন শুরুই হয় আকীদার বিশুদ্ধতা দিয়ে। আর যার ঈমান ও বিশ্বাস নিখুঁত—তার ছোট ছোট আমলও আল্লাহর কাছে অত্যন্ত মহার্ঘ বলে বিবেচিত হয়।

সুতরাং প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব হলো—কোন কোন বিশ্বাস মুসলমানের জন্য অপরিহার্য, কোন আকীদা ছাড়া একজন মানুষকে মুসলিম বলা যায় না—সেগুলো সুস্পষ্টভাবে জানা। ইসলামের এই মৌলিক আকীদাগুলো পৃথিবীর সব মুসলমানের মধ্যেই একরূপ; এ বিষয়ে কোনো মতভেদ নেই।

এই শুদ্ধ আকীদাই মানুষের অন্তরকে আলোকিত করে, তাকে সঠিক পথে স্থির রাখে এবং ইসলামের সমগ্র ইবাদত-আমলকে গ্রহণযোগ্যতার সৌন্দর্যে পূর্ণ করে।

ইসলামের ভিত্তি দাঁড়িয়ে আছে একদম বিশুদ্ধ ও স্বচ্ছ আকীদার ওপর। আকীদা ঠিক থাকলে আমল গ্রহণযোগ্য হয়, আর আকীদা বিকৃত হলে বাহ্যিক ইবাদতও আল্লাহর কাছে মর্যাদাহীন হয়ে পড়ে। তাই প্রথমেই প্রয়োজন সঠিক বিশ্বাসকে নিশ্চিত করা। ইসলাম যেসব মৌলিক আকীদাকে ভিত্তি হিসেবে স্থাপন করেছে, সেগুলো সংক্ষেপে নিচে তুলে ধরা হলো—

১. তাওহীদ—আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস

তাওহীদ হলো ইসলামের হৃদয়। এক আল্লাহ ছাড়া আর কেউ উপাস্য নয়—এ বিশ্বাসের ওপর দাঁড়িয়ে আছে পুরো দীন। আল্লাহর সঙ্গে কোন সৃষ্ট সত্তাকে অংশীদার করা, তাঁর গুণাবলি অন্য কাউকে দেওয়া, তাঁর মত ক্ষমতা অন্য কারও মধ্যে কল্পনা করা—সবই শির্ক। আর শির্ক আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় গুনাহ।

আল্লাহ বলেনঃ

قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ۝ اللهُ الصَّمَدُ

বলুন—তিনি আল্লাহ, এক ও অদ্বিতীয়।
আল্লাহ এমন সত্তা, যিনি কারো মুখাপেক্ষী নন; বরং সকল সৃষ্টিই তাঁর উপর নির্ভরশীল।
(সূরা ইখলাস: ১-২)

আর তিনি যখন কোন কিছু সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেন তখন শুধু বলেন—

كُنْ فَيَكُونُ

“হও—অবিলম্বে তা হয়ে যায়।”
(সূরা ইয়াসীন: ৮২)

তাওহীদ এমন এক বিশ্বাস যেখানে আল্লাহ কারো শরীক নন—না উপাসনায়, না ইলাহিক ক্ষমতায়, না শাসনকাজে। তিনিই রিজিক দানকারী, তিনিই রোগ নিরাময়কারী, তিনিই দুঃখ-

কষ্ট দূরকারী। বান্দা তাঁর সামনে সরাসরি দো'আ করবে—মধ্যস্থতা বা 'অন্তরালে কাউকে বসানোর' প্রয়োজন নেই।

২. তকদীরের ভাল-মন্দ আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে।

ইসলামের আরেকটি মৌলিক বিশ্বাস হলো—সৃষ্টিজীবনের প্রতিটি ঘটনা আল্লাহর জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। ভবিষ্যতে যা ঘটবে আল্লাহ আগেই তা জানেন এবং যা তিনি ইচ্ছা করেন তা-ই ঘটে।

রাসূল ﷺ বলেন:
"তুমি যা ভুল করেছো, তা তোমার কাছে আসারই ছিল না; আর যা পেয়েছো, তা কখনো তোমার থেকে ভুলে যেতে পারত না।" (তিরমিজি)

৩. ফেরেশতা, জিন ও শয়তানে বিশ্বাস

ইসলাম শেখায়—আল্লাহর বিশেষ সৃষ্টিকুল হিসেবে ফেরেশতারা আছেন, যারা সবসময় আল্লাহর হুকুম পালন করেন। যেমন—জিবরাইল (আ) ওয়াহী নাজিল করতেন।
মানুষকে বিপথে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে শয়তান ও তার অনুগামীরা। এছাড়াও জিন জাতির অস্তিত্বও সত্য।

---

৪. কোরআন—আল্লাহর কালাম

কোরআন আল্লাহর বাণী; এর এক হরফও মানুষের বানানো নয়। এ কিতাব বিকৃতি, পরিবর্তন, সংযোজন—সবকিছু থেকে সংরক্ষিত। কোরআন সম্পর্কে সন্দেহ বা বিকৃতির বিশ্বাস মুসলিম পরিচয় নষ্ট করে দেয়।

আল্লাহ বলেনঃ

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

"নিশ্চয়ই আমি কোরআন নাজিল করেছি এবং অবশ্যই আমি তার রক্ষক।" (সূরা হিজর: ৯)

৫. মৃত্যু-পরবর্তী জীবন, হিসাব-নিকাশ ও জান্নাত-জাহান্নাম

আখিরাতের প্রতি ঈমান ছাড়া ইসলামের কাঠামোই দাঁড়ায় না। মৃত্যুর পর পুনরুত্থান, কবরের আযাব বা নেয়ামত, কিয়ামতের ময়দানের হিসাব, এবং জান্নাত-জাহান্নাম—এসবই সত্য।

কোরআন ঘোষণা করে—
"যে শস্যদানা বা পর্বতমাত্র অণুকণা কাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে।" (সূরা যিলযাল: ৭-৮)

৬. নবীদের প্রতি ঈমান এবং মুহাম্মদ ﷺ-এর চূড়ান্ত নবুয়ত

আল্লাহ মানুষকে সঠিক পথ দেখাতে বহু নবী পাঠিয়েছেন। তাঁদের মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর বিধান ও নির্দেশ পৌঁছে দিয়েছেন।
মুহাম্মাদ ﷺ হচ্ছেন সর্বশেষ নবী, তাঁর পর আর কেউ নবী নন।

কোরআন বলে—

خَاتَمَ النَّبِيِّينَ

"তিনিই নবীদের সীলমোহর।" (সূরা আহযাব: ৪০)

ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দীন আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

(৭) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পর মুসলমানদের ইমাম ও সত্যনিষ্ঠ খলীফা ছিলেন। এরপর হযরত ওমর (রা), অতঃপর হযরত উছমান (রা), অতঃপর হযরত 'আলী (রা)। সাহাবায়ে কিরাম (রা) মুসলমানদের ধর্মীয় নেতা ও পথ-প্রদর্শক। তাঁদের সমালোচনা তথা তাঁদের সম্পর্কে মন্দ ও বিরূপ আলোচনা হারাম। তাঁদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন আমাদের জন্য ওয়াজিব।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইবাদত

সালাত (নামায):

সালাত ইসলামের সর্বপ্রধান রোকন, দীনের মূল স্তম্ভ এবং মুসলমানের পরিচয়ের অন্যতম প্রধান নিদর্শন। এটি এমন এক ইবাদত, যা ঈমান ও কুফরের মাঝখানে এক সুস্পষ্ট সীমারেখা হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। ইসলামের পরিচিতি, শৃঙ্খলা, আনুগত্য—এসবের সবচেয়ে উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটে সালাতের মাধ্যমে।

আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দেন—

"وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ"

অর্থ: তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা করো এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।
(সূরা আর-রূম, আয়াত ৩১)

রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন—
"বন্দা ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সালাত পরিত্যাগ করা।"
(বুখারী, মুসলিম)

আরেকটি বর্ণনায় এসেছে—
"কুফর ও ঈমানের মধ্যবর্তী পার্থক্য হলো সালাত ত্যাগ করা।"
(তিরমিযী)

এভাবে কুরআন ও সুন্নাহ উভয়েতেই স্পষ্ট ঘোষণা করা হয়েছে যে, সালাত শুধু একটি ইবাদত নয়; বরং এটি ঈমানের রক্ষা–কঠিন প্রাচীর এবং মুক্তি-নাজাতের মূল চাবিকাঠি।

সালাতের সর্বজনীন বাধ্যবাধকতা

সালাত হলো এমন ফরয, যা থেকে কোনো মানুষ—ধনী-গরিব, সুস্থ-অসুস্থ, স্বাধীন-বন্দি, মুসাফির-মুকীম—কেউই মুক্ত নয়।

- দাঁড়িয়ে না পারলে বসে,
- বসেও না পারলে শুয়ে,
- শুয়েও না পারলে ইশারায়—

তবুও সালাত আদায় করতে হবে।

যুদ্ধক্ষেত্রেও সালাতের হুকুম রহিত হয়নি; বরং বিশেষ নিয়মে সালাতুল খাওফ আদায়ের বিধান এসেছে। সফরের জন্য সুবিধা হিসেবে চার রাকাত সালাতকে দুই রাকাতে কসর করা হয়েছে, তবে ফরযের বাধ্যবাধকতা কখনোই প্রত্যাহার হয়নি।

সালাতের এ সর্বাত্মক বাধ্যবাধকতা প্রমাণ করে—
এটি এমন ইবাদত, যা কোনো নবী, কোনো রাসূল, কোনো ওলী, কোনো মুজাহিদ—কারও জন্যই ছাড়ার সুযোগ নেই।

সালাত: মু'মিনের জীবনের আলো ও নিরাপত্তা

যেমন পানি ছাড়া মাছ বাঁচতে পারে না—তেমনি সালাত ছাড়া একজন সত্যিকারের মুমিনের আত্মা নিস্তেজ হয়ে পড়ে। সালাত মুমিনের জন্য প্রশান্তির ছায়া, আল্লাহর দরবারে রক্ষা-কবচ ও নৈতিক শক্তির উৎস।

কুরআনে আল্লাহ বলেন—

"إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ"

অর্থ: নিশ্চয়ই সালাত অশ্লীলতা ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।
(সূরা আনকাবূত, আয়াত ৪৫)

একজন মানুষের সালাত যদি সত্যিকার অর্থে সালাত হয়—
তবে সে মন্দ থেকে দূরে থাকে, জাহিলিয়াতের আচরণ ত্যাগ করে, চরিত্র ও আত্মাকে পরিচ্ছন্ন রাখে, এবং আল্লাহর সাথে দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন করে।

সালাত: হেদায়েত ও তাকওয়ার ভিত্তি

আল্লাহ তাআলা সালাতকে হেদায়েত ও তাকওয়া হাসিলের মৌলিক শর্ত হিসেবে ঘোষণা করেছেন। যার সালাত ঠিক—তার ঈমান শক্তিশালী; যার ঈমান শক্তিশালী—তার চরিত্র সুন্দর; আর যার চরিত্র সুন্দর—তার সমাজে প্রভাব ইতিবাচক।

সালাত তাই শুধু ব্যক্তিগত ইবাদত নয়; এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থার সুদৃঢ় ভিত্তি, যা মুসলমানকে নৈতিকতা, আনুগত্য, আধ্যাত্মিকতা ও মানবিকতার পথে দৃঢ় রাখে।

আযান ও এর অর্থ

আযান হলো ইসলামের ইবাদতের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা, যা প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময় উচ্চারিত হয়। আযানের আওয়াজ শহর, গ্রাম বা যে কোন জনবসতিতে পৌঁছে, মুসলমানদের নামাযের জন্য প্রস্তুত করে। আযান মূলত আল্লাহর একত্ব ও নবী মুহাম্মাদ (সা.)-এর রাসূলত্বকে ঘোষণা করে।

আযানের শব্দ এবং অর্থ হলো:

الله أكبر، الله أكبر

আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান।

الله أكبر، الله أكبر

আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান।

أشهد أن لا إله إلا الله

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই।

أشهد أن لا إله إلا الله

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই।

أشهد أن محمدا رسول الله

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রসূল।

أشهد أن محمدا رسول الله

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রসূল।

حي على الصلاة

সালাতের জন্য এসো, নামায আদায়ে এসো।

حي على الصلاة

নির্বিঘ্নে কল্যাণের জন্য এসো।

حي على الفلاح

উন্নতি ও সাফল্যের জন্য এসো।

الله أكبر، الله أكبر

আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান।

لا إله إلا الله

আল্লাহর বাইরে আর কোনো মা'বুদ নেই।

আযান: সালাতের আহ্বান ও ইসলামের ঘোষণা

আযান হলো ইসলামের ইবাদত ও কল্যাণের আহ্বান, যা মুসলিম সম্প্রদায়কে নামাযের জন্য প্রস্তুত করে। আল্লাহ তা'আলা আযানের মাধ্যমে কেবল সালাতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যই জানাননি, বরং ইসলামের সার্বিক উদ্দেশ্য, তৌহীদের পরিচয় ও দীনের রূহের সুনিপুণ বিশ্লেষণও এতে সংযুক্ত করেছেন। মুওয়াযযিন দৈনিক পাঁচবার মসজিদের মীনার থেকে সমুচ্চ কণ্ঠে আযান উচ্চারণ করেন, যা মুসলিমদের জন্য এক সুনির্দিষ্ট ও নিবিড় দাওয়াতের আকার ধারণ করে।

আযান দুইটি মূল সাক্ষ্য ধারণ করে:

১. আল্লাহর একত্ব (তৌহীদ)

২. মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সা)-এর নবুওত।

আযান:

اشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহর রসূল।

এতে মুসলমানদের সালাতের জন্য আহবান জানানো হয় এবং প্রকাশ করা হয় যে, সালাত দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের একমাত্র পথ। আযান হৃদয় ও বুদ্ধিবৃত্তি উভয়কে সম্বোধন করে, গাফিলকে সতর্ক করে এবং অলসকে কর্মতৎপর করে তোলে।

পাক-পবিত্রতা ও ওযু

সালাতের জন্য পাক-পবিত্রতা অর্জন অপরিহার্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنكُم مِّنَ الْغَائِطِ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا
(সূরা মায়িদা, ৬ আয়াত)
অর্থ: মু'মিনগণ! যখন সালাতের জন্য প্রস্তুত হবে, তখন মুখ ও হাত কনুই পর্যন্ত ধুতে হবে, মাথায় হাত বুলাতে হবে, এবং পা টাখনু পর্যন্ত ধুতে হবে। যদি পানি না পাওয়া যায়, তবে পবিত্র মাটির মাধ্যমে তায়াম্মুম করতে হবে।

ওযু ও পবিত্রতা ঈমান ও ইহতিসাবের সঙ্গে সম্পন্ন হলে মুসলমানের ভেতর সজাগতা, মনোযোগ ও সালাতের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন:

"যখন কেউ ওযু করে এবং মুখ, হাত ও পা ধোয়, তখন তার সেই অংশের দ্বারা করা সমস্ত ছোটো বড়ো গোনাহ মুছে যায়।"
(সহীহ মুসলিম, তিরমিজি)

فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ

"তারা যদি তওবা করে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে—তবে তারা তোমাদের দীনধর্মের ভাই।"
সূরা তওবা: আয়াত **১১**

ইসলামে যাকাতের গুরুত্ব ও শরঈ মর্যাদা

কুরআন মজীদে বিরাশি জায়গায় সালাতের সঙ্গে যাকাতের উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন—
أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
"সালাত কায়েম কর এবং যাকাত দাও।"

আবার মু'মিনদের গুণ বর্ণনা করতে বলা হয়েছে—
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
"তাঁরা সালাত কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ যাকাতকে ইসলামের মৌলিক খুঁটির (রোকন) অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন—

ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত:

১. সাক্ষ্য দেওয়া যে আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রসূল।
২. সালাত কায়েম করা।
৩. যাকাত প্রদান করা।
৪. হজ্জ করা।
৫. রমজানে সিয়াম পালন করা।

এক ব্যক্তি ইসলামের পরিচয় জানতে চাইলে রাসূল ﷺ বলেন—
"আল্লাহর ইবাদত কর, তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক করো না, ফরয সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং রমজানের রোযা পালন কর।"
(বুখারী ও মুসলিম)

ইবনু ছা'লাবা (রা.)-এর হাদীসে এসেছে—
তিনি জিজ্ঞেস করেন, "আল্লাহ কি আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন ধনীদের কাছ থেকে যাকাত নিয়ে গরীবদের মাঝে বিতরণ করতে?"
নবী ﷺ বললেন— "হ্যাঁ।"

যাকাত সম্পর্কিত হাদীস এত বেশি সংখ্যক যে তা গণনা কঠিন, এবং এ বিষয়ে উম্মাহর সর্বসম্মত—যাকাত ইসলামের একটি অপরিহার্য রোকন এবং প্রথম যুগ থেকে আজ পর্যন্ত মুসলমানেরা নিরবচ্ছিন্নভাবে এটি পালন করে আসছে।

সালাত–যাকাত: ইসলামের বিশুদ্ধতার চিহ্ন

আল্লাহ তা'আলা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন—

فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

বাংলা অর্থ:
"কিন্তু তারা যদি তওবা করে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত দেয়, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"
(সূরা তওবা, ৫ আয়াত)

فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

এরপর তারা যদি তওবা করে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয় তবে তারা তোমাদের দীন সম্পর্কে ভাই; জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আমি নিদর্শন স্পষ্টরূপ বর্ণনা করি। "সূরা তওবা: **১১** আয়াত

বুখারী ও মুসলিমে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: আমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, আমি লোকের সাথে যা করব যতক্ষণ না তারা এ কথার সাক্ষ্য দেয়, আল্লাহ ভিন্ন কোন মা'বুদ নেই জ মুহাম্মদ (সা)

আল্লাহর রসূল, সালাত কায়েম করবে ও যাকাত দেবে। যদি তার করে তবে তারা তাদের রক্ত ও ধন-সম্পদ আমার থেকে হেফাজত করে নিল ইসলামের হক ছাড়া। আর তাদের হিসাব আল্লাহর ওপর; চাইলে হিসাব তিনি পারেন, আবার ক্ষমাও করে দিতে পারেন।

যাকাত কিসের ওপর ওয়াজিব

রসূলুল্লাহ (সা) যাকাতের পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন এবং যেসব সম্পদের ওপর যাকাত ফরজ তা চিহ্নিত করেছেন। এছাড়া যাকাত কখন ওয়াজিব হবে তাও তিনি উল্লেখ করেছেন। মূলত যাকাত চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যা মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত

1. কৃষি ও বাগবাগিচার ফসল

2. পশুপাল – উট, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি

3. সোনা ও রূপা

4. ব্যবসার মালামাল ও পুঁজি

যাকাত বছরে একবার ফরজ। কৃষি ও বাগবাগিচার ক্ষেত্রে পূর্ণ বছর ধরা হবে ফসল পেকে গেলে। আকস্মিকভাবে প্রাপ্ত সম্পদের ওপর তা সাথে সাথেই ওয়াজিব, এক-পঞ্চমাংশ হারে। নিজের শ্রম ও প্রয়াসে অর্জিত সম্পদে এক দশমাংশ। যেমন চাষবাস, বাগবাগিচা ইত্যাদিতে মালিকের শ্রমের ওপর নির্ভরতা অনুযায়ী নির্ধারিত হারে যাকাত দেওয়া হয়।

যদি ফসল উৎপাদনে মালিক নিজে পানি সেচ বা বিশেষ তত্ত্বাবধান দেন, তবে শস্যের বিশ ভাগের এক ভাগ বা চল্লিশ ভাগের এক ভাগ ওয়াজিব হবে। ব্যবসা, দোকানপাট, কল-কারখানা ইত্যাদির মতো সম্পদে দেখাশোনা বেশি থাকায় তারও অনুপাত অনুসারে নির্ধারণ করা হয়।

নির্দিষ্ট নিসাব অনুযায়ী রৌপ্য, সোনা, খাদ্যশস্য ও ফলমূল, পশু ও অন্যান্য সম্পদের ওপর নির্ধারিত পরিমাণে যাকাত দেওয়া হয়। এটি ধনীর মাল কিছু অংশ দিয়ে গরীব ও অসহায়দের সহায়তা করার মাধ্যমে সমাজে ন্যায় ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা।

সিয়াম

সিয়ামের হুকুম ও এতদসম্পর্কিত আয়াত

সিয়ামের হুকুম

১. ফরজ (বাধ্যতামূলক)

রমজান মাসের রোযা প্রতিটি বালেগ, সুস্থ, মুসলিমের ওপর ফরজ।
➡ দেরিতে জাগা, ক্লান্ত থাকা—এসব অজুহাতে রোজা বাদ যায় না।
➡ ফরজ রোজা ইচ্ছা করে ভাঙলে কাফফারা দিতে হয় (৬০ জন মিসকিনকে খাওয়ানো / পরপর ৬০ দিন রোজা ইত্যাদি)।

২. ওয়াজিব

কেউ রমজানের রোজা নষ্ট করলে কেবল কাজা দেওয়া ওয়াজিব।
➡ অসুস্থতা, ভ্রমণ, মাসিক—এসব কারণে রোজা না রাখলে শুধু কজা দিলেই হয়।

৩. নফল (ঐচ্ছিক) রোজা

রমজানের বাইরে যেসব রোজা রাখা যায়—

সোমবার ও বৃহস্পতিবার

আরফার দিন

আশুরার দিন

শাবান মাসের কিছু রোজা
এসব রোজা অনেক সওয়াবের এবং নফল ইবাদত।

ইসলামের পাঁচ রোকনের একটি হলো সিয়াম বা রোযা। এটি মুসলমানদের জন্য এমন একটি ইবাদত, যা আত্মসংযম, তাকওয়া, চরিত্রগঠন ও আত্মশুদ্ধির প্রশিক্ষণ দেয়। আল্লাহ তা'আলা মোমিনদের ওপর সিয়াম ফরয করেছেন হিজরতের পর এমন সময়ে, যখন মুসলমানরা মদীনা মুনাওয়ারায় একটি স্থিতিশীল ও নিরাপদ পরিবেশ পেয়েছিল। কারণ মক্কার নিপীড়নময় সময় যদি রোযা ফরয করা হতো, অনেকে এটিকে দারিদ্র্য ও অভাবের সঙ্গে যুক্ত কষ্টকর আমল হিসেবে ভাবতে পারত।
অন্যদিকে তখন মুসলমানদের ঈমান দৃঢ় হয়ে গিয়েছিল, নামাজ প্রতিষ্ঠা তাদের জীবনের অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল, শরীয়তের হুকুম মানার মানসিক প্রস্তুতি তৈরি ছিল। ঠিক সেই পরিবেশে আল্লাহ সিয়ামের ফরযিয়তের ঘোষণা দেন।

সিয়াম ফরয হওয়ার আয়াত

আল্লাহ বলেন –

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝

أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۚ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

(সূরা আল-বাকারা: ১৮৩–১৮৫)

অর্থ:

“হে মুমিনগণ! তোমাদের ওপর রোযা ফরয করা হলো, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর—যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো।
কয়েক নির্দিষ্ট দিনের জন্য। তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে বা সফরে থাকলে পরবর্তী সময়ে সেই সংখ্যক রোযা পূরণ করবে। আর যারা অত্যন্ত কষ্ট সহ্য করে রাখতে পারে, তাদের জন্য ফিদইয়াহ আছে—একজন মিসকীনকে খাদ্যদান। যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নেক কাজ করে, তা তার জন্য উত্তম। আর যদি তোমরা জানতে তবে বুঝতে—রোযা রাখা তোমাদের জন্যই ভালো।

রমযান মাস—যাতে অবতীর্ণ হয়েছে কুরআন—মানবজাতির হিদায়াত, স্পষ্ট প্রমাণ এবং সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাস পাবে, সে যেন রোযা রাখে। আর কেউ অসুস্থ বা সফরে থাকলে পরে সেই দিনের রোযা আদায় করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ চান, কঠোরতা চান না; যাতে তোমরা সংখ্যা পূর্ণ কর, আল্লাহর তাওফিকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং তাঁর মহিমা ঘোষণা কর।”
(বাকারা: ১৮৩–১৮৫)

আয়াতের তাৎপর্য

এই আয়াতটি শুধুই একটি আইন ঘোষণা নয়—এটি হৃদয়, বিবেক, আকীদা ও অনুভূতিকে একসঙ্গে স্পর্শ করে।

- প্রথমেই বলা হয়েছে— “হে মুমিনগণ” —যা মুমিনদের মানসিকভাবে প্রস্তুত করে।

■ রোযা কেন ফরয—এর কারণও বলে দেওয়া হয়েছে: তাকওয়া অর্জন।

■ অসুস্থ, সফরে থাকা এবং অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য স্পষ্ট ও সহজ বিধান রাখা হয়েছে—যা ইসলামের নমনীয়তা প্রকাশ করে।

■ রমজানের মর্যাদা, কুরআনের নাযিল হওয়া এবং এই মাসের আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্যও তুলে ধরা হয়েছে।

এ আয়াতগুলো থেকে স্পষ্ট—
সিয়াম মানুষের জন্য কষ্টদায়ক পরীক্ষা নয়, বরং আত্মশুদ্ধি, নৈতিক উন্নতি ও মানসিক পরিশুদ্ধির প্রশিক্ষণ। রোজা মানুষকে তার কামনা-বাসনার ওপর নিয়ন্ত্রণকারী করে তোলে। যখন একজন ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বৈধ খাবার-পানি পর্যন্ত পরিত্যাগ করতে পারে—তখন সে হারাম থেকে বাঁচা আরও সহজ হয়। এটাই আয়াতের “لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ”—অর্থাৎ তাকওয়া অর্জনের গভীর বাস্তব রূপ।

সিয়ামের ফজায়েল (গুণাবলি ও উপকারিতা)

১. তাকওয়া অর্জন

আল্লাহ নিজে বলেছেন—
"যাতে তোমরা পরহেজগার হতে পারো"।
রোজা মানুষকে নিজের নফস, গুনাহ, নিয়ন্ত্রণ—সবকিছুর ওপর শক্তি দেয়।

২. রিযিকের বরকত

রোজা মানুষকে কৃপণতা থেকে দূরে রাখে, দানশীলতা বাড়ায়।
বরকত বাড়ে, মনে শান্তি আসে।

৩. জান্নাতে বিশেষ দরজা – রাইয়ান

রোজাদারদের জন্য আল্লাহ আলাদা দরজা বানিয়েছেন—রাইয়ান।
ওই দরজা দিয়ে শুধু রোজাদাররাই যাবে... এটা ভাবলেই গায়ে কাঁটা দেয়, তাই না?

৪. পাপ মোচন

হাদিসে আছে—
"যে ঈমান ও সওয়াবের আশায় রোজা রাখবে, তার পূর্বের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।"

৫. আত্ম-শুদ্ধি ও চরিত্র গঠন

রোজা মানুষের রাগ, খারাপ ভাষা, খারাপ অভ্যাস—সব নিয়ন্ত্রণ করে।
এক ধরনের "ডিটক্স" হয়—শরীরেও, মনে-মনেও।

৬. শারীরিক উপকারিতা

ইনসুলিন নিয়ন্ত্রণ

ওজন কমানো

ডাইজেশন ঠিক রাখা

টক্সিন বের করে দেওয়া

মানসিক ফোকাস বাড়ানো
রোজা মানে শরীর-মন দুইটাই ক্লিন হয়ে যায়।

৭. আল্লাহর কাছে বিশেষ মাকাম

রোজাদারের দোয়া আল্লাহ কখনো ফেরত দেন না।
আর রোজাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর কাছে মিশকের চেয়ে প্রিয়।

রমযান মাস আল্লাহ তাআলা এমনভাবে নির্ধারণ করেছেন, যেন এটি হয় ইবাদত-বন্দেগীর এক বিশ্বব্যাপী মৌসুম এবং নেক আমলের একটি সাধারণ উৎসব। পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ—বিশ্বজুড়ে সব মুসলমান এই মাসে একই আবেগে, একই নিয়মে আর একই উদ্দেশ্যে ইবাদতে ঝুঁকে পড়ে।

ধনী–গরীব, আলেম–জাহেল, শিক্ষিত–অশিক্ষিত, শহর–গ্রাম—সব স্তরের মানুষের ঘরেই রমযানের রঙ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ধনীর প্রাসাদে যেমন, গরীবের ঝুপড়িতেও ঠিক তেমনই এই মাসের নূরানী পরিবেশ ছড়িয়ে পড়ে। এর সৌন্দর্য হলো—কেউ নিজের মতামত বা খেয়াল-খুশিকে বড় করে দেখে না, কেউ কারো সাথে রোজা রাখা নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ করে না। পুরো মুসলিম সমাজ একই ঢঙে আল্লাহর হুকুম পালন করে।

যে কেউ মুসলিম ভূখণ্ডের যেকোনো অংশে তাকালেই রমযানের সেই মর্যাদা, শান্তি ও পবিত্রতার ছোঁয়া অনুভব করতে পারে। মনে হয় যেন পুরো মুসলিম উম্মাহর ওপর নূর ও সাকিনাহর একটি শান্ত ছায়া নেমে এসেছে।

এমনকি যারা সারা বছর কিছুটা গাফিল থাকে, যারা ইবাদতে পিছিয়ে থাকে—রমযান এলে তারাও লজ্জায় বা সামাজিক সম্মান বজায় রাখতে রোজা রাখার চেষ্টা করে। কেউ যদি বৈধ কারণে (যেমন রোগী বা মুসাফির) রোজা না রাখে, সেও গোপনে ও সংকোচের সাথে খায়। শুধু একদম অল্প কিছু ধর্মদ্রোহী ছাড়া আর কেউ প্রকাশ্যে রোজা ভঙ্গের সাহস পায় না।

রমযান হল এমন এক সমষ্টিগত ইবাদত, যার প্রভাবে—

হৃদয় নরম হয়,

ইমানী আবেগ জাগ্রত হয়,

ইবাদত সহজ হয়ে যায়,

আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য বাড়ে,

মানুষের মধ্যে সহানুভূতি, দয়া, সমবেদনা বৃদ্ধি পায়।

এক কথায়, রমযান মাস মুসলিম সমাজে ইবাদতের বিশ্বব্যাপী উৎসব এবং নেক আমলের সাধারণ আবহ তৈরি করে, যেখানে প্রতিটি মুসলমান—নিজ অবস্থানে থেকেও—একই স্রোতে ভেসে যায়।

সিয়ামের রূহ ও হাকীকতের হিফাজত

ইসলামী শরীয়ত সিয়ামকে শুধু বাহ্যিক নিয়ম—খানা-পিনা ও দৈহিক সম্পর্ক ত্যাগ—এই পর্যন্ত সীমিত রাখেনি। বরং সিয়ামের রূহ, লক্ষ্য ও আধ্যাত্মিকতা রক্ষাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। কারণ সিয়ামের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো মানুষের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করা, চরিত্রকে সুন্দর করা এবং তাকওয়ার গুণে সজ্জিত করা।

বাহ্যিক নয়, অন্তরের সিয়ামই আসল

নবী করীম (সা.) শুধু খাওয়া-দাওয়া থেকে বিরত থাকার কথা বলেননি, বরং এমন প্রতিটি কাজকে নিষিদ্ধ করেছেন, যা রোজার মহিমা ও উদ্দেশ্যের বিরোধী—

- অশ্লীল কথা
- কটুবাক্য
- ঝগড়া-বিবাদ
- মিথ্যা বলা
- গীবত

■ কুৎসা রটানো

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন—

“সিয়ামের সময় কেউ অশ্লীল কথা বলবে না, ঝগড়া করবে না। কেউ গালি দিলে বা ঝগড়া করতে চাইলে সে বলবে—‘আমি রোজাদার।’”

— (বুখারি)

আরেক হাদিসে ইরশাদ—

“যে ব্যক্তি রোজা রেখে মিথ্যা কথা ও মিথ্যা কাজ ত্যাগ করে না, আল্লাহর কাছে তার ক্ষুধা-তৃষ্ণার কোনো মূল্য নেই।”

) —বুখারি(

অর্থাৎ যে রোজায় তাকওয়া ও আত্মসংযম নেই, তা যেন প্রাণহীন দেহের মতো—আকৃতি আছে, সারবস্তু নেই। এজন্যই হাদিসে এসেছে—

“অনেক রোজাদার আছে, যার রোজা থেকে ক্ষুধা-তৃষ্ণা ছাড়া আর কিছুই লাভ হয় না।”

) —ইবন মাজাহ(

সিয়াম হলো ঢাল

হযরত আবু উবায়দা (রা.) বর্ণনা করেন, রসূল (সা.) বলেন—

“সিয়াম হলো (গোনাহ থেকে) আত্মরক্ষার ঢাল; যতক্ষণ না সে নিজেই তা ছিঁড়ে ফেলে।”

) —নাসায়ী(

অর্থাৎ রোজা মানুষকে গোনাহ থেকে রক্ষা করে, কিন্তু যদি সে নিজেই গোনাহে লিপ্ত হয়, তবে এই ঢাল ভেঙে যায়।

সিয়ামের ইতিবাচক দিক – আত্মশুদ্ধির মৌসুম

ইসলামে সিয়াম কেবল নিষিদ্ধ কাজ বর্জনের ইবাদত নয়; বরং এর রয়েছে বহু ইতিবাচক দিক—

✔ইবাদত-বন্দেগী

✔কুরআন তেলাওয়াত

✔যিকির-আযকার

✔তসবীহ-তাহলীল

✔দরিদ্রদের সহায়তা

✔পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি-সমবেদনা

✔কল্যাণকামিতা ও উদারতা

এ মাস সম্পর্কে রাসূল (সা.) বলেন—

“যে এই মাসে একটি নফল আমল করবে, সে যেন অন্য মাসে একটি ফরজ আদায় করল; আর যে একটি ফরজ আদায় করবে, সে যেন অন্য মাসে সত্তরটি ফরজ আদায় করল।”

) —ইবন খুযাইমাহ(

তিনি আরও বলেন—

“এই মাস হলো ধৈর্যের মাস, আর ধৈর্যের প্রতিদান জান্নাত।”

) ইবন খুযাইমা(

ইফতার করানোর ফজিলত

যায়দ ইবন খালিদ আল-জুহানী (রা.) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেন—

“যে ব্যক্তি কোনো রোজাদারকে ইফতার করাবে, সে রোজাদারের সমপরিমাণ সওয়াব পাবে, অথচ রোজাদারের সওয়াব কোনোভাবেই কমবে না।

(তিরমিজি)

তারাবিহর গুরুত্ব

তারাবিহ নামাজ নবীজী (সা.)-এর আমল থেকে প্রমাণিত। তিনি কয়েক দিন জামাতে আদায় করেছিলেন, কিন্তু পরে আশঙ্কা করেন—উম্মতের ওপর তা ফরজ হয়ে গেলে তাদের জন্য

কষ্ট হবে। তাই তিনি নিয়মিত জামাত ত্যাগ করেন। কিন্তু পুরো উম্মত আজও তারাবিহকে গুরুত্বসহকারে পালন করে; যা রমযানকে পরিপূর্ণ ইবাদতের মৌসুমে পরিণত করেছে।

রমজান—ইবাদত, তওবা ও কোরআনের বসন্ত

রমজান এমন এক মাস, যখন—

- ■ ইমানি জযবা বেড়ে যায়
- ■ হৃদয় নরম হয়
- ■ গোনাহ থেকে ফিরে আসার আগ্রহ বাড়ে
- ■ তওবা-ইস্তিগফারের সুযোগ তৈরি হয়
- ■ কল্যাণে প্রতিযোগিতা চরমে পৌঁছে

রমজান তাই মুসলমানদের জন্য
ইবাদতের উৎসব,
কুরআনের মৌসুম,
এবং আত্মশুদ্ধির বসন্ত।

ই'তিকাফ : হুকুম, উদ্দেশ্য ও فضائل

রমাযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ একটি ইবাদত। এটি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অতি প্রিয় সুন্নত এবং রমাযানের আত্মিক লক্ষ্য পূরণের অন্যতম মাধ্যম। ই'তিকাফের মাধ্যমে বান্দা দুনিয়ার ব্যস্ততা থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে, সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর ইবাদতে নিজেকে নিয়োজিত করে এবং নফসের তাজকিয়া, হৃদয়ের পবিত্রতা ও তাকওয়ার প্রকৃত স্বাদ লাভ করতে পারে।

ই'তিকাফের আমলসমূহ

ই'তিকাফ অবস্থায় নিম্নোক্ত ইবাদতগুলোতে অধিক মনোযোগী হওয়া মুস্তাহাব—

সালাত (ফরজ, নফল ও তাহাজ্জুদ),

কুরআন তিলাওয়াত,

আল্লাহর যিকর,

তাসবীহ: “সুবহানাল্লাহ”

তাহমীদ: “আলহামদুলিল্লাহ”

তাকবীর: “আল্লাহু আকবর”

তওবা ও ইস্তিগফার,

নবী করীম ﷺ-এর ওপর দরূদ শরীফ পাঠ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ই‘তিকাফ

হাদীসসমূহে ই‘তিকাফের গুরুত্ব অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন:

> “রাসূলুল্লাহ ﷺ রমাযানের শেষ দশ দিনে নিয়মিত ই‘তিকাফ করতেন এবং তাঁর ইন্তেকালের আগ পর্যন্ত এই আমল অব্যাহত ছিল। তাঁর মৃত্যু পরবর্তীতে তাঁর সহধর্মিণীরা এই ই‘তিকাফ অব্যাহত রাখেন।”
—(সহিহ বুখারি)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন:

> “রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতি রমাযানে দশ দিন ই‘তিকাফ করতেন, আর যেই বছরে তিনি ইন্তেকাল করেন, সেই বছর তিনি বিশ দিন ই‘তিকাফ করেন।”
—(সহিহ বুখারি)

এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে ই‘তিকাফ ছিল তাঁর নিয়মিত আমল, এবং এর ফযীলত ছিল অত্যন্ত বেশি।

ই‘তিকাফের বিধান

ই‘তিকাফ অবস্থায় অযথা মসজিদের বাইরে যাওয়া বৈধ নয়।
শুধুমাত্র মানবীয় প্রয়োজন—

পেশাব,

পায়খানা,

ফরয গোসল—

এসব ছাড়া বের হওয়া নিষিদ্ধ।

ওযু অবশ্যই মসজিদের ভেতর বা সীমার ভেতরেই সম্পন্ন করতে হবে। ই‘তিকাফের আসল উদ্দেশ্য—মসজিদের ভেতর অবস্থান করে আল্লাহর ইবাদতে নিজেকে নিবেদন করা—এটা যেন ভঙ্গ না হয়।

ই‘তিকাফের গুরুত্ব

ই‘তিকাফ রমাযানকে পরিণত করে ইবাদত-বন্দেগীর গভীরতম মৌসুমে। এই ইবাদত মানুষকে একান্তে আল্লাহর নৈকট্য লাভে সহায়তা করে। নেককার, ইবাদতগুযার ও মুত্তাকী

বান্দাদের জন্য ই‘তিকাফ যেন এক আত্মিক বসন্ত, যেখানে তারা হৃদয়কে ইসলাহ করে, নফসকে পরিশুদ্ধ করে এবং রমাযানের প্রকৃত লক্ষ্য অর্জনে অগ্রসর হয়।

লায়লাতুল কদর (শবে কদর)

কুরআন মাজীদ এবং হাদীস শরীফে লায়লাতুল কদরের فضائل অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা সূরা আল-কদরে বলেন—

> “আমি কুরআন নাযিল করেছি এক মহিমান্বিত রজনীতে। এবং আপনি কি জানেন, মহিমান্বিত রজনী কী? এই মহিমান্বিত রজনী হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। এ রাতে ফেরেশতাগণ ও রূহ (জিবরাইল আ.) অবতীর্ণ হয় তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে সকল বিষয় নিয়ে। শান্তিই শান্তি; সেই রাত ভোরের উদয় পর্যন্ত।”
> —(সূরা আল-কদর: ১–৫)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

> “যে ব্যক্তি লায়লাতুল কদরের রাতে ঈমান ও ইহতিসাবের সাথে ইবাদত করবে, তার পূর্বের সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।”
> —(বুখারী ও মুসলিম)

আল্লাহ তাঁর অপার হিকমতের কারণে লায়লাতুল কদরকে রমাযানের শেষ দশকের মধ্যে গোপন রেখেছেন—
যাতে মুসলমানরা তা অনুসন্ধানে আগ্রহী থাকে, ইবাদতে মনোযোগ দেয় এবং শেষ দশক অধিক ইবাদতে কাটায়। এটাই ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ–এর নিয়ম।

হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন—

> “রমাযানের শেষ দশক শুরু হলেই রাসূলুল্লাহ ﷺ রাত জেগে ইবাদত করতেন, পরিবারের লোকদেরও জাগিয়ে দিতেন এবং নিজেও ইবাদতে পূর্ণ মনোযোগ দিতেন।”

—(বুখারী ও মুসলিম)

লায়লাতুল কদর কোন রাতে?

হাদীস অনুযায়ী লায়লাতুল কদর রমাযানের শেষ দশকের মধ্যেই এবং এরও শেষ সাত দিনের বেজোড় রাতগুলোতে।

ইবনে ওমর (রা) বলেন—

> “কিছু সাহাবীর স্বপ্নে দেখা যায় যে লায়লাতুল কদর শেষ সাত দিনে। রাসূল ﷺ বললেন: তোমাদের স্বপ্ন এক জায়গায় মিলেছে। সুতরাং তোমরা এটি শেষ সাত দিনের মধ্যেই অনুসন্ধান কর।”
—(বুখারী ও মুসলিম)

হযরত আয়েশা (রা) আরও বলেন—

> “রাসূলুল্লাহ ﷺ রমাযানের শেষ দশকে ই‘তিকাফ করতেন এবং বলতেন—লায়লাতুল কদরকে শেষ দশকে অনুসন্ধান কর।”
—(বুখারী ও মুসলিম)

আরেক বর্ণনায়—

> “আপনারা লায়লাতুল কদর রমাযানের শেষ দশকের বেজোড় রাতগুলোতে অনুসন্ধান কর।”
—(বুখারী)

আল্লাহ تعالى সূরা হজ্জে এভাবে ঘোষণা দিয়েছেন—

> “মানবজাতির মাঝে হজ্জের জন্য আহ্বান করে দাও। তারা তোমার কাছে আসবে পদব্রজে এবং নানা দুর্বল–ক্লান্ত বাহনে চড়ে, দূর-দূরান্তর পথ অতিক্রম করে। যাতে তারা নির্ধারিত কল্যাণময় স্থানগুলোয় উপস্থিত হতে পারে এবং আল্লাহ যে চতুষ্পদ জন্তু তাদের রিযিক হিসেবে দিয়েছেন, নির্দিষ্ট দিনগুলোতে তার ওপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে পারে। এরপর তারা তা থেকে নিজেদের জন্যও খাবে এবং অভাবগ্রস্ত ও দরিদ্রদেরও খাওয়াবে। তারপর তারা নিজেদের পরিচ্ছন্নতা সম্পন্ন করবে, মানত পূর্ণ করবে এবং এই প্রাচীন ঘর (কাবা)-এর তাওয়াফ করবে।”
> — সূরা হজ্জ: ২৭–২৯

হজ্জ ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রুকন, চতুর্থ ভিত্তি। একজন মুসলমানের ওপর হজ্জ ফরজ হয় যখন তার শারীরিক সক্ষমতা, পথ নিরাপত্তা, এবং আর্থিক সামর্থ্য পূরণ হয়। এই শর্তগুলো موجود থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ হজ্জ আদায় না করে, তবে কুরআন ও হাদীসে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় এ ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে—এমনকি এমন শঙ্কাও উঠে যে সে ইসলামের পরিপূর্ণ আনুগত্যের সীমা থেকে দূরে সরে যেতে পারে।

হজ্জ একটি নির্দিষ্ট সময় ও নির্দিষ্ট স্থানে আদায় করা হয়। ইসলামী ক্যালেন্ডারের শেষ মাস যিলহজ্জের ৯ তারিখে আরাফাতের ময়দানে উপস্থিত হওয়া হজ্জের মূল রুকন। ৮ তারিখ (তারওয়িয়া), ৯ তারিখ (আরাফা), ১০ তারিখ (ইদুল-আযহা), এবং পরবর্তী দিনগুলোতে মিনার বিভিন্ন আমল সম্পন্ন করা হয়। আরাফাত দাঁড়ানো ছাড়া হজ্জ পূর্ণ হয় না—এ কারণে আরাফাতকে বলা হয়: “الحج عرفة” (হজ্জ হলো আরাফা)।

হযরত ইবরাহীম (আ) এমন এক পরিবেশে জন্মগ্রহণ করেন, যেখানে তাঁর পরিবারসহ পুরো সমাজ ছিল গভীর মূর্তিপূজায় নিমগ্ন। পিতা আজার ছিলেন মূর্তি নির্মাতা এবং পূজারি। এই শির্কাচ্ছন্ন পরিবেশে বেড়ে উঠলেও ইবরাহীম (আ)-এর হৃদয় ছিল স্বভাবগতভাবে নির্মল এবং তাওহিদী চিন্তায় প্রবণ। তিনি প্রথম পর্যায়ে নিজের পরিবার ও সমাজকে মূর্তিপূজার অযৌক্তিকতা বোঝানোর মাধ্যমে দাওয়াতের কাজ শুরু করেন। দীর্ঘ বিতর্ক, যুক্তি ও দাওয়াত সত্ত্বেও জনগণ তাঁর কথাকে প্রত্যাখ্যান করে এবং মূর্তি ভাঙার অভিযোগে তাঁকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে। আল্লাহ তাঁকে ঐ পরিস্থিতি থেকে নিরাপদে রক্ষা করেন এবং এরপরই তাঁর জীবনে শুরু হয় ধারাবাহিক হিজরতের ধারা।

ইবরাহীম (আ) সিরিয়া, ফিলিস্তিন ও মিসর অতিক্রম করে আল্লাহর নির্দেশে তাঁর স্ত্রী হাজেরা (আ) ও শিশু ইসমাঈল (আ)-কে একটি নির্জন ও মানবশূন্য উপত্যকায় রেখে যান। সেই উপত্যকাই পরবর্তীতে মক্কা নগরীতে রূপ নেয়। এই স্থানটি সম্পূর্ণ বিরান, পানিশূন্য ও বসতিহীন ছিল। হাজেরা (আ) সন্তানের জন্য পানির সন্ধানে সাফা ও মারওয়া পাহাড় দুটির মাঝে ছুটোছুটি করেন, যার ফলস্বরূপ আল্লাহর রহমতে যমযমের উত্থান ঘটে। যমযমের জন্ম মক্কার ইতিহাসে একটি মৌলিক মোড় ঘুরিয়ে দেয়, কারণ পানির উৎস পাওয়ায় সেখানে ধীরে ধীরে মানুষ বসতি স্থাপন করতে শুরু করে এবং একটি স্থায়ী নগরী গড়ে ওঠে।

পরিস্থিতি স্থিতিশীল হওয়ার পর ইবরাহীম (আ) পুনরায় মক্কায় ফিরে আসেন। আল্লাহ তাঁকে ইসমাঈল (আ)-কে নিয়ে কাবা নির্মাণের আদেশ দেন। পিতা-পুত্র কাবা নির্মাণের সময় আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন—এই নগরীকে নিরাপদ শহর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। এই দোয়ারই বাস্তব ফল হলো মক্কার “বালাদুল আমীন” পরিচয়। অর্থাৎ মক্কা একটি নিরাপদ, সম্মানিত ও বরকতময় শহর হিসেবে কুরআনে স্বীকৃতি লাভ করে। কাবা নির্মাণের মাধ্যমে মক্কা শুধু ভূগোলগত কারণে নয়, বরং আধ্যাত্মিক কেন্দ্র হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইবরাহীম (আ)-এর জীবনে আরেকটি বড় পরীক্ষা ছিল ইসমাঈল (আ)-কে কুরবানি করার নির্দেশ। তিনি ও তাঁর পুত্র উভয়েই আল্লাহর আদেশে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করায় এই ঘটনাকে কুরআনে “মহা পরীক্ষা” হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। পরে আল্লাহ ইসমাঈল (আ)-এর

পরিবর্তে কুরবানির জন্য আসমানী দুম্বা পাঠান। হজের আনুষ্ঠানিকতায় কুরবানি যে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে, তার উৎস এই ঘটনাই। শয়তান তিনবার ইবরাহীম (আ), হাজেরা (আ) ও ইসমাঈল (আ)-কে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করলে তাঁরা প্রত্যেকবার পাথর নিক্ষেপ করে শয়তানকে প্রতিহত করেন। হজের "রমী জিমারাত"—এই ঘটনারই প্রতীকী স্মরণ।

হজের প্রায় প্রতিটি আনুষ্ঠানিকতার শেকড়ই ইবরাহীম (আ) ও তাঁর পরিবারকে ঘিরে থাকা ঘটনাগুলোতে নিহিত। সাফা-মারওয়ার সাঈ, যমযমের পানি, কুরবানি, রমী, কাবা তাওয়াফ—সবই তাঁদের জীবনের বাস্তব ঘটনার ধারাবাহিক স্মৃতি। ফলে মক্কার সাথে ইবরাহীম (আ)-এর সম্পর্ক শুধু ঐতিহাসিক নয়; বরং আধ্যাত্মিক, তাওহিদী ও মানবিক সংগ্রামের এক অনন্য ধারাবাহিকতা।

ইবরাহীম (আ) মক্কা নগরী ও তাঁর বংশধরদের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন যাতে আল্লাহ তাঁদের মধ্য থেকে একজন রাসুল পাঠান—যিনি তাওহিদের দাওয়াত প্রতিষ্ঠা করবেন। এই দোয়ারই ফল হিসেবে পরবর্তীতে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন মুহাম্মদ (সা.)। অর্থাৎ নবীজির আগমনও ইবরাহীম (আ)-এর দোয়ার পূর্ণতা।

সার্বিকভাবে দেখা যায়, মক্কা—যাকে কুরআনে "বালাদুল আমীন" বলা হয়েছে—তার অস্তিত্ব, গুরুত্ব ও পবিত্রতা ইবরাহীম (আ)-এর জীবনের ঘটনা, পরীক্ষা, দোয়া এবং আল্লাহর বিশেষ নির্দেশনার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। মক্কার আধ্যাত্মিক পরিচয় ইবরাহীম (আ)-এর তাওহিদী আদর্শ ও সংগ্রামের ধারাবাহিক বাস্তব রূপ।

হজ্জ ইবরাহীম (আ)-এর আমল ও সিফতের স্মারক এবং তাঁর দাওয়াত ও তা'লীমের নবায়ন

হজ্জ এমন এক মহৎ ইবাদত, যা হযরত ইবরাহীম (আ.), তাঁর পরিবার এবং তাঁদের ঈমান, তাওয়াক্কুল ও আত্মত্যাগের স্মৃতিকে জীবন্ত করে তুলে। হজ্জের প্রতিটি ধাপ—ইহরাম, উকুফ, তাওয়াফ, সাঈ, রমী ও কুরবানী—ইবরাহীমি জীবনের ঘটনাবলিকে স্মরণ করিয়ে দেয় এবং সেই মহান শিক্ষাগুলোর পুনর্জাগরণ ঘটায়।

ইহরামের সরল সাদা পোশাক মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আল্লাহর সামনে সকলের সমতার দিকে। এতে বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে, অহংকার, বংশীয় গর্ব বা মান-মর্যাদার বাহ্যিক পরিচয় এখানে কোনো মূল্য বহন করে না। উকুফে আরাফাতে অবস্থান মানুষকে সম্পূর্ণ ভাবে আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে শেখায়—এটা আত্মসমর্পণ, ক্ষমা প্রার্থনা ও আত্মবিশ্লেষণের মুহূর্ত। সাঈ হযরত হাজেরা (আ.)-এর তাওয়াক্কুলভরা সংগ্রামের স্মৃতি বহন করে, আর রমী শয়তানের বিরুদ্ধে মানুষের মানসিক ও নৈতিক প্রতিরোধের প্রতীক। কুরবানী মানুষের জীবনে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের বাস্তব চর্চা।

হজ্জের এসব আমল আসলে তাওহীদকে দৃঢ় করা, অসত্য উপাসনা, কুসংস্কার ও মিথ্যা মূল্যবোধকে অস্বীকার করা এবং আল্লাহর আদেশের সামনে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের প্রশিক্ষণ। এটি মানুষের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে, কৃত্রিম ভেদাভেদ দূর করে এবং মুসলিম উম্মাহর ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব ও আধ্যাত্মিক শক্তিকে সুদৃঢ় করে।

ইবরাহীম (আ.)-এর পথ অনুসরণ করা মানে তাঁর মনোবল, ত্যাগ, ঈমান এবং দাওয়াতকে নিজের জীবনে কার্যকর করা ও তা নবায়ন করা। যুগে যুগে তাঁর আহ্বানকে সমুন্নত রাখাই হজ্জের অন্যতম লক্ষ্য। আল্লাহ তাআলা বলেন—

“এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাত। তিনি এর আগে তোমাদের নাম রেখেছেন মুসলিম—এই কিতাবেও—যাতে রসূল তোমাদের উপর সাক্ষী হন এবং তোমরা সাক্ষী হও মানবজাতির উপর। সুতরাং সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে আঁকড়ে ধর। তিনিই উত্তম অভিভাবক ও উত্তম সাহায্যকারী।”
—সূরা হজ্জ : ৭৮

ইতিহাসের নতুন শিরোনাম, মানবতার সীমারেখা

হযরত ইবরাহীম (আ.)—তাঁর দাওয়াত, সংগ্রাম ও আত্মোৎসর্গ—মানবসভ্যতার এক নতুন অধ্যায় নির্মাণ করেছে। তাঁর শিক্ষা এমন এক আলোকিত শিরোনাম, যার নিচে মানবতার ইতিহাস দুই ভিন্ন ধারায় বিভক্ত হয়ে যায়। একপাশে সত্য, তাওহীদ ও ন্যায়ের সংগ্রাম; অন্য

পাশে মিথ্যা, বিচ্যুতি ও ভ্রষ্টতার পথ। এই দ্বন্দ্ব কেবল তাঁর যুগেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং মানবসমাজের অন্তরে সর্বযুগে বিরাজমান থেকে গেছে।

আল্লাহ তাআলা ইবরাহীম (আ.)-কে যে ইমামত, নেতৃত্ব ও দাওয়াত প্রদান করেছেন, তা সাময়িক নয়—এটি চিরস্থায়ী মর্যাদা। তাঁর বংশধরদের জন্য নবুওত, রূহানী নেতৃত্ব এবং মানবজাতিকে সঠিক দিশা দেখানোর দায়িত্ব নির্ধারিত করা হয়েছে। একই সঙ্গে সত্যের প্রতিষ্ঠা, মিথ্যার বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান, আল্লাহর পথে দা'ওয়াত, আর মানবতার বিপন্ন নৌকাকে নিরাপদ তীরে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বও তাঁদের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পথ মূলত আত্মত্যাগ, তাওয়াক্কুল, দৃঢ় ঈমান এবং অবিচল সংগ্রামের পথ। মানবতার পথ রক্ষা, সত্যের প্রদীপকে ঝড়-ঝঞ্ঝার মাঝেও জ্বালিয়ে রাখা এবং নৈতিকতার ওপর ভিত্তি করে সভ্যতার দিকনির্দেশনা দেওয়া—এগুলোই তাঁর উত্তরাধিকার। এই দায়িত্ব যুগে যুগে তাঁর অনুসারীদের হাতে অর্পিত হয়েছে, এবং মানবজাতির মুক্তি নিশ্চিত করার জন্য এ দায়িত্ব আজও একইভাবে অপরিবর্তিত।

মানবতার আশ্রয়

হজ্জ এবং হজ্জের মৌসুমে সম্পাদিত সমস্ত ইবাদত—যা মানাসিক নামে পরিচিত—মূলত মিল্লাতে ইবরাহীমের আত্মিক ঐতিহ্যের পুনর্জাগরণ। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মক্কা-মু'আজ্জামায় মিলিত হওয়া এ বিশাল সমাবেশ শুধু ইবরাহীমি উত্তরাধিকারীদের মাঝে সম্পর্ক পুনর্গঠনই নয়; বরং তাদের ঈমান, আকীদা, উদ্দেশ্য ও জীবনদর্শনের নবায়নেরও একটি মহান সুযোগ। হজ্জের এই বার্ষিক মিলনমেলা মানবতার কল্যাণ, ঐক্য ও অস্তিত্বের জন্য এক অপরিহার্য আশ্রয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পবিত্র কা'বা, হারাম মাস, কুরবানীর জন্য উৎসর্গীকৃত পশু এবং কা'বার দিকে প্রেরিত মালা-পরা হাদী—এসবই মানুষের সামগ্রিক মঙ্গল ও কল্যাণের উদ্দেশ্যে আল্লাহ নিজেই নির্ধারণ করেছেন। এগুলোর মধ্যে লুকানো রয়েছে মানবজাতির শিক্ষা, শান্তি, সংযম, পারস্পরিক সম্পর্ক ও নৈতিকতার এক অনন্য বার্তা।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

“আল্লাহ পবিত্র কা'বা, হারাম মাস, কুরবানীর পশু এবং মালা-পরা হাদীকে মানুষের কল্যাণের জন্য নির্ধারণ করেছেন, যাতে তোমরা জানো যে আসমান ও জমিনের সবকিছুই আল্লাহর জ্ঞাতসারেই রয়েছে; নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ।” (সূরা মায়িদা: ৯৭)

হজ্জ তাই শুধু একটি ইবাদত নয়—এটি মানবতার জন্য নিরাপদ পথ, আত্মিক প্রশিক্ষণ, তাওহীদের কেন্দ্রে ফিরে আসা এবং আল্লাহর বিধানের প্রতি সমষ্টিগত অঙ্গীকার নবায়নের এক মহাসুযোগ।

হজ্জের মূল আনুষঙ্গিক কাজ

হজ্জ কেবল একটি দৈহিক বা বাহ্যিক আনুষ্ঠানিকতা নয়, এটি মানব জীবনের ঈমান ও রূহানির সর্বোচ্চ প্রকাশ। এটি সেই প্রতিটি মুহূর্তের সমষ্টি যেখানে একজন মু'মিন আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টির জন্য নিজের সব কিছু উৎসর্গ করে। হজ্জের প্রক্রিয়া শুরু হয় ইহরাম গ্রহণ থেকে, যেখানে হাজী বিশেষ পোশাক পরিধান করে নিজেকে অহংকার, শারীরিক আবেগ ও দৈনন্দিন অভ্যাস থেকে আলাদা করে আল্লাহর প্রতি একান্ত নিবেদন প্রদর্শন করেন।

এরপর হাজী কা'বার চারপাশে তওয়াফ সম্পন্ন করেন, যা আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ অনুগততা এবং শির্ক ও মূর্তিপূজা থেকে মুক্তির চিহ্ন। তারপর সাঈ করেন, সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মধ্যে দৌড় বা হেঁটে, যা হাজেরা (রা)-এর ধৈর্য, বিশ্বাস ও আল্লাহর ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরতার স্মৃতি।

হজ্জের অন্যতম প্রধান অংশ ওয়ুকুফ আরাফাতে, যেখানে হাজীরা দিনের বেলা আল্লাহর সমীপে দাঁড়িয়ে বা বসে প্রার্থনা, দু'আ ও আত্মসমালোচনা করেন। এটি একজন মু'মিনের আত্মসমর্পণ, পাপমুক্তি ও ঈমানের নবায়নের প্রতীক। এরপর মিনায় পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমে শয়তানের প্রতি বিদ্রোহ প্রকাশ করা হয়, যা খারাপের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান ও সতর্কতার শিক্ষা দেয়।

কুরবানী হজ্জের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যেখানে পশু কোরবানির মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, আত্মত্যাগ এবং মানবিক সহমর্মিতা প্রদর্শিত হয়। শেষে হাজীরা হাল্ক বা কুচ সম্পন্ন করেন, যা ইহরামের শৃঙ্খলা পূর্ণ করে এবং আত্মশুদ্ধি প্রকাশের নিখুঁত প্রতীক।

এই সমস্ত আনুষঙ্গিক কাজ কেবল রীতিনীতির অংশ নয়, বরং এগুলো তওহীদ, আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল, মানবতার প্রতি দায়িত্ববোধ এবং আত্মত্যাগের সংস্কারকে শক্তিশালী করে। হাজীর হৃদয় ও মন পূর্ণভাবে আল্লাহর দিকে কেন্দ্রীভূত হয়, আর সকল বাহ্যিক ভ্রান্তি, অহংকার, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও মূর্তিপূজা থেকে মুক্তি লাভ করে। প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি দিকফেরত, প্রতিটি দোয়া ও কর্ম ইসলামের মূল শিক্ষা এবং হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দাওয়াত ও তাওহীদের নবায়ন হিসেবে মানবজাতির জন্য স্থায়ী দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে।

তৃতীয় অধ্যায় মুসলমানদের কতিপয় জাতীয় ও ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য

১ম বৈশিষ্ট্যঃ আকীদা এবং স্থায়ী দীন ও শরীয়ত

মুসলমানদের প্রথম ও সবচেয়ে মৌলিক বৈশিষ্ট্য হল—তাদের জাতীয় সত্তা ও জীবনদর্শনের ভিত্তি একটি পরিষ্কার ও সুনির্দিষ্ট আকীদা-বিশ্বাস, এবং একটি স্থায়ী, চিরন্তন দীন ও শরীয়ত।

ইসলামের অনুসারীদের পরিচয় কোনো ব্যক্তির নাম, কোনো বংশ, কোনো দেশ অথবা কোনো ধর্মীয় নেতার নামে নির্ভর করে না। বরং তাদের পরিচয় এসেছে“ ইসলাম ” শব্দ থেকে—যার অর্থ আল্লাহর সামনে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ, আনুগত্য ও সোপর্দ করা। এ কারণেই মুসলমানরা নিজেদেরকে মুহাম্মদী, ঈসায়ী বা ইয়াহূদীদের মতো কোনো ব্যক্তিত্ব বা স্থানের নামে পরিচিত করে না; বরং তারা চিরকাল“ মুসলিম—”এই উপাধিই গ্রহণ করেছে।

এই আকীদা ও শরীয়ত মুসলমানদের কাছে শুধু বিশ্বাস বা ইবাদতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা ব্যক্তিজীবন, পারস্পরিক সম্পর্ক, সামাজিক ব্যবস্থা, নৈতিক আচরণ এবং মুসলমানদের পুরো সভ্যতার ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। তাই মুসলমানরা তাদের দীন, আকীদা ও শরীয়তের ব্যাপারে অত্যন্ত সংবেদনশীল।

মুসলমানদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইন (Personal Law)-এর ভিত্তিও কুরআন মজীদ, হাদীস ও ফিকহশাস্ত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ কারণে কোনো সরকার, রাষ্ট্র বা আইন-প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠান শরীয়তের নির্ধারিত আইন-ব্যবস্থায় পরিবর্তনের অধিকার রাখে না। যা কুরআন-হাদীস দ্বারা নিশ্চিত এবং উম্মাহর ঐকমত্যে প্রতিষ্ঠিত—তা পরিবর্তনযোগ্য নয়।

তবে যেসব বিষয় ইজতিহাদী, অর্থাৎ সময়ের পরিবর্তনে ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে আলেমদের গবেষণার সুযোগ রয়েছে—সে বিষয়গুলোতে শাস্ত্রবিদরা নতুন

পরিস্থিতি অনুযায়ী সমাধান দিতে পারেন। ইসলামের ইতিহাসে যুগে যুগে এই প্রক্রিয়া চলেছে এবং ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

২য় বৈশিষ্ট্যঃ পবিত্রতার সুনির্দিষ্ট ধারণা ও ব্যবস্থা

মুসলমানদের দ্বিতীয় জাতীয় বৈশিষ্ট্য হলো—পবিত্রতা বা তাহারাতের একটি পরিষ্কার, নির্দিষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ ধারণা। এখানে দুটি বিষয় আলাদা করে বোঝা জরুরি:
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং পাক-পবিত্রতা—দুটি এক জিনিস নয়।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা মানে হলো শরীর, পোশাক ও আশপাশের পরিবেশে দৃশ্যমান কোনো ময়লা, দুর্গন্ধ বা আবর্জনা না থাকা। কাপড় সাফ হওয়া, দেহ সুন্দরভাবে ধোয়া থাকা—এগুলো সাধারণ পরিচ্ছন্নতার অংশ।

কিন্তু পাক-পবিত্রতা (Purification)—ইসলামে আরও গভীর অর্থ বহন করে।
শরীর বা পোশাকে যদি পেশাব, পায়খানা, রক্ত, মদের ফোঁটা, গোবর- বর্জ্য ইত্যাদি নাপাক জিনিস লেগে থাকে, তাহলে শরীর বাইরে থেকে যতই পরিষ্কার দেখা যাক, তা ইসলামের দৃষ্টিতে পবিত্র গণ্য হয় না। এ অবস্থায় নামায পড়াও বৈধ নয়।

এছাড়াও পেশাব-পায়খানা করার পর ইস্তিঞ্জা না করলে অথবা গোসল ফরজ হওয়ার পর গোসল না করলে মানুষ নাপাক থাকে। এই অবস্থায় ইবাদত করা নিষিদ্ধ। একই নিয়ম ঘর, পাত্র, বিছানা ও ভূমির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কোনো স্থান বা বস্তু শুধু দাগমুক্ত বা চোখে পরিস্কার দেখালেই তা পাক হয় না; নাপাকি যদি লাগা অবস্থায় থাকে তবে তা অবশ্যই শরীয়তসম্মত পদ্ধতিতে পরিষ্কার করতে হবে।

সুতরাং পবিত্রতা ইসলামের কাছে শুধু পরিচ্ছন্নতার মানদণ্ড নয়; বরং তা ইবাদত, নৈতিকতা ও দৈনন্দিন জীবনের অত্যাবশ্যক অংশ। এ কারণেই মুসলমানদের জীবনে তাহারাত একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচিত।

মুসলমানদের তৃতীয় জাতীয় বৈশিষ্ট্য হলো—তাদের খাদ্যাভ্যাস, পানীয় এবং পশু-পাখীর গোশত ব্যবহারের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা নেই। ইসলাম স্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছে কোন খাদ্য হালাল, আর কোনটি হারাম, কোনটি পবিত্র (তায়্যিব) আর কোনটি অপবিত্র ও নিষিদ্ধ (খবীছ)। এই নির্ধারিত সীমারেখা একজন মুসলমানের জন্য অতিক্রম করা বৈধ নয়।

পশু-পাখীর গোশতের ক্ষেত্রেও মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে। তারা কেবল সেই গোশতই গ্রহণ করতে পারে, যা শরীয়তসম্মত পদ্ধতিতে যবাই করা হয়েছে, এবং যবাইয়ের সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়েছে। যদি কোনো পশু শরঈ তরীকা অনুযায়ী যবাইকৃত না হয়, অথবা শিকারকৃত পাখী হালাল হওয়ার উপযুক্ত অবস্থায় না আসে—তাহলে সেই গোশত মৃত পশুর মতো গণ্য হবে এবং তা খাওয়া হারাম।

এমনকি যবাই করার সময় যদি আল্লাহর পরিবর্তে অন্য কারো নামে—দেবতা, মূর্তি, পীর, শহীদ বা অন্য কোনো ব্যক্তির নামে—যবাই করা হয়, তবে সেই গোশতও সম্পূর্ণ হারাম।

ইসলামে কিছু প্রাণী আছে যাদের গোশত চিরকাল হারাম, যেমন শূকর ও কুকুর। কিছু প্রাণী আছে যাদের গোশত হারাম হলেও তারা স্বভাবগতভাবে অপবিত্র নয়, যেমন: হিংস্র প্রাণী—সিংহ, নেকড়ে, চিতাবাঘ ইত্যাদি। পাখীদের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম—যে সব পাখী শিকারি এবং নখ বা পাঞ্জা দিয়ে ধরে ছিড়ে খায়, যেমন চিল, শকুন, বাজ, এগুলো হারাম; আর যেসব পাখী এসব স্বভাবের নয়, সেগুলো সাধারণভাবে হালাল।

মদ বা সকল প্রকার নেশাজাতীয় পানীয় ইসলামে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। কুরআন একে “উম্মুল-খাবাইছ”—অপবিত্রতার মূল—রূপে চিহ্নিত করেছে। মুসলমানদের জন্য তা যে কোনো অবস্থায় হারাম।

এভাবে খাদ্য ও পানীয়ের ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহর এই সুস্পষ্ট নির্দেশনা মুসলমানদেরকে একটি স্বতন্ত্র পরিচয় দিয়েছে এবং যেখানেই তারা বসবাস করুক না কেন, এই বিধানের অনুসারী হওয়াই তাদের ধর্মীয় দায়িত্ব।

মুসলমানদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, তারা নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও আল-কুরআনের প্রতি গভীর ভালবাসা, সম্মান ও আন্তরিক অনুগতিতা পোষণ করে। এই ভালবাসা শুধু আবেগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং তাঁর আদর্শকে অনুসরণ করা, তাঁর সুন্নাহকে সম্মান করা এবং কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা—এসবই সেই ভালবাসার স্বাভাবিক প্রকাশ।

মুসলমানরা নবী (সা.)-কে একজন শ্রদ্ধেয় নেতা, পথপ্রদর্শক এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত মহান রসূল হিসেবে ভালবাসে। তাঁর মর্যাদা এত উচ্চ যে, তাঁকে স্মরণ করতে গেলে বলা হয়—
"আল্লাহর পরে সর্বোচ্চ মর্যাদা তাঁরই।"
অর্থাৎ পৃথিবীতে আল্লাহর সব বান্দার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক সম্মানিত হলেন আমাদের নবী মুহাম্মদ (সা.)।

তবে ইসলামে এও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, নবী (সা.)-এর প্রতি ভালবাসা যেন অতিরিক্ত অতিশয়োক্তি বা শেরেকী ভাবনায় রূপ না নেয়। যেমন—আগের কিছু উম্মত যেভাবে তাদের নবীদের মর্যাদাকে সীমার বাইরে নিয়ে গিয়েছিল। নবী (সা.) নিজেই সতর্ক করে বলেছেন,
"তোমরা আমাকে সেইভাবে বাড়িয়ে দেবে না যেমন খ্রিস্টানরা ঈসা (আ.)-কে বাড়িয়ে দিয়েছে। তোমরা শুধু এতটুকুই বলবে—আমি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল।"

অর্থাৎ, মুসলমানদের ভালবাসা হবে শুদ্ধ, আন্তরিক এবং সীমার মধ্যে—যেখানে সম্মান আছে, অনুসরণ আছে, কিন্তু কোনো অতিরঞ্জন নেই।

নবী (সা.)-এর প্রতি এই ভারসাম্যপূর্ণ ভালবাসা কুরআনের প্রতি ভালবাসার সাথেও অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। কারণ নবী (সা.)-ই ছিলেন কুরআনের প্রথম ব্যাখ্যাকার, প্রথম অনুসারী এবং কুরআনের বাস্তব অনুকরণীয় মডেল। তাই যে ব্যক্তি কুরআনকে ভালবাসে, সে স্বাভাবিকভাবেই নবী (সা.)-কেও ভালবাসবে; আর যে নবী (সা.)-কে ভালবাসে, সে তাঁর নিয়ে আসা কুরআনের দিকেই ফিরে যাবে।

সুতরাং মুসলমানদের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—
নবী (সা.)–এর প্রতি শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও তাঁর সুন্নাহ অনুসরণ—এবং কুরআনকে জীবনের সর্বোচ্চ দিশারি হিসেবে গ্রহণ করা।

পঞ্চম বৈশিষ্ট্য: বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্বের সঙ্গে সংযোগ ও সম্পর্ক

মুসলমানদের পঞ্চম জাতীয় বৈশিষ্ট্য হলো তাদের বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর সঙ্গে গভীর সংযোগ ও সম্পর্ক থাকা। মুসলমানরা নিজেদেরকে শুধু কোনো একটি দেশ বা জাতির অংশ হিসেবে দেখেন না, বরং তারা নিজেদেরকে বিশ্বব্যাপী মিল্লাতের সদস্য হিসেবে গণ্য করে। তারা নিজেদের ধর্মকে আসমানী ও সর্বজনীন ধর্ম হিসেবে বিশ্বাস করে এবং সেই বিশ্বাস অনুযায়ী বিশ্বের অন্য মুসলিমদের দুঃখ-কষ্ট ও সমস্যার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়।

যে দেশে তারা বসবাস করে, সেই দেশের উন্নয়ন ও কল্যাণে তারা সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়। একই সঙ্গে তারা আন্তর্জাতিক মুসলিম সম্প্রদায়ের ক্ষুদ্র বা বৃহৎ সদস্য হিসেবে তাদের নৈতিক দায়িত্বও অনুভব করে। অন্য মুসলিম দেশের বিপর্যয়, দারিদ্র্য বা অন্য সমস্যায় তারা প্রভাবিত হয় এবং সম্ভবপর ক্ষেত্রে সহায়তা বা সমর্থন প্রদানের চেষ্টা করে। এই বৈশিষ্ট্য তাদের জাতীয় মনোবৃত্তি, ইতিহাস ও শিক্ষার সঙ্গে মিশে থাকা একটি স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। তাই মুসলমানদের এই বৈশিষ্ট্যটি বোঝা এবং সম্মান করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৪র্থ অধ্যায় মুসলমানদের সমাজ ও সামাজিকতা

শিশুর জন্ম ও আকীকা

মুসলমান সমাজে নবজাতকের আগমনকে অত্যন্ত পবিত্র ও আনন্দের ঘটনা হিসেবে দেখা হয়। শিশুর জন্মের পর প্রথম যে কাজ করা হয় তা হলো, তার কানে আযান ও একামত বলা। ডান কানে আযান এবং বাম কানে একামত উচ্চারণ করা হয়। যদিও নবজাতক তখন কিছুই বুঝতে পারে না, তবুও এই আযান ও একামতের মাধ্যমে শিশুর জীবনের প্রথম মুহূর্ত থেকেই আল্লাহর নাম ও ইবাদতের প্রতি পরিচয় পৌঁছে দেয়া হয়। এছাড়াও নবজাতকের মুখে খেজুর বা খোরমার ছোট একটি টুকরা দেওয়া হয়, যা রসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নতের অংশ।

শিশুর জন্মের সপ্তম দিনে আকীকা করা সুন্নত। যদি কোনো কারণে সপ্তম দিনে সম্ভব না হয়, তবে চৌদ্দ বা একুশ দিনে তা করা যায়। ছেলে শিশুর জন্য দুইটি ছাগল এবং মেয়ের জন্য একটি ছাগল যবেহ করা হয়। এর গোস্ত গরীব, মিসকীন ও আত্মীয়স্বজনের মাঝে বিতরণ করা হয়, এবং পরিবারের সদস্যদের জন্যও কিছু রাখা হয়। আকীকা শরীয়তের দৃষ্টিতে ফরয নয়, কিন্তু মুস্তাহাব, অর্থাৎ সুন্নতের অংশ। সামর্থ্য না থাকলে এটি করা বাধ্যতামূলক নয়।

শিশুর নামকরণও সাধারণত আকীকার সময় করা হয়। নাম রাখার ক্ষেত্রে অধিকাংশ মুসলিম পরিবারের পক্ষ থেকে আরবী নামকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়, যাতে শিশুর নামের মাধ্যমে মুসলমানত্ব প্রকাশ পায়। নামের মধ্যে আল্লাহর বন্দেগী ও তৌহিদবাদী ভাব প্রকাশিত হয়। যেমন, “আব্দুল্লাহ”, “আব্দুর রহমান”, “আব্দুস সামাদ” ইত্যাদি। নাম রাখার ক্ষেত্রে শিরক, অহংকার বা অবাধ্যতার প্রকাশ যেন না হয়, সেই নিয়ম অনুসরণ করা হয়।

সাধারণভাবে মুসলমানরা নবজাতকের নামকরণে মহানবী (সা)-এর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত সাহাবা, পরিবারের পছন্দমত বরকতপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম অথবা নবী-রাসূলের নামের দিকে অগ্রাধিকার দেয়। ফলে ইতিহাস ও বংশগততার কারণে শিশুদের নামের মধ্যে বিভিন্ন নবী ও সাহাবাদের নাম দেখা যায়, যেমন ইসহাক (আ), ইয়াকুব, ইউসুফ, দাউদ, সুলায়মান, মূসা, হারূন, ঈসা, ইমরান, যাকারিয়া ও ইয়াহইয়া। মহিলাদের ক্ষেত্রে মরিয়ম, আসিয়া ও সফুরার মতো নাম ব্যবহৃত হয়।

এই পুরো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নবজাতক মুসলিম সমাজের সঙ্গে তার প্রথম সংযোগ স্থাপন করে এবং ইসলামী পরিচয় পায়।

পাক-পবিত্রতার তা'লীম

শিশু যখন কিছুটা বড় হয় এবং বোঝার যোগ্য বয়সে পৌঁছায়, তখন তাকে পাক-পবিত্রতার শিক্ষা দেওয়া শুরু করা হয়। এর অর্থ, শিশুকে শেখানো হয় কিভাবে পেশাব বা পায়খানার পর পানি ব্যবহার করে নিজেকে পবিত্র রাখতে হয়, কীভাবে নাপাক বা অপবিত্র বস্তু থেকে দূরে থাকা যায়, এবং কিভাবে শরীর, পরিধেয় কাপড় ও পোশাককে নাপাক ও অপবিত্রতা থেকে রক্ষা করতে হয়।

নিশ্চয়ই, একটি শিশু এই বিষয়গুলো সম্পূর্ণভাবে বোঝা বা সতর্কভাবে অনুসরণ করা শুরু করতে পারে না। এ কারণে তার পরিবেশ, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, পারিবারিক ঐতিহ্য এবং পিতামাতার নজরদারি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই পর্যায়ে একজন দীনদার ও ধর্মপ্রাণ পিতা-মাতা যত্নসহকারে শিশুকে পাক-পবিত্রতার নিয়মাবলী শেখানো নিশ্চিত করেন এবং এটি তাদের দায়িত্বও বলা যায়।

সালাতের শিক্ষা ও তালকীন

শিশু যখন কিছুটা বড় হয়, তখন তাকে সালাতের প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া শুরু করা হয়। এর মধ্যে থাকে ওযু করা শেখা, অর্থাৎ কিভাবে শরীরকে পবিত্র করে নামাজের জন্য প্রস্তুত হতে হয়। এই বয়সে শিশুর মধ্যে সালাতের প্রতি আগ্রহ ও সচেতনতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হয়।

অধিকাংশ সময় শিশুর বাবা বা পরিবারের বৃদ্ধ সদস্য তাকে হাতে ধরে মসজিদে নিয়ে যান এবং সেখানে শিশু বৃদ্ধ বা মহল্লাবাসীর সঙ্গে দাঁড়িয়ে সালাতের অনুকরণ করতে থাকে। হাদীসের নির্দেশ অনুযায়ী, শিশু সাত বছর বয়সে সালাত পড়ার জন্য বলা হবে এবং দশ

বছর বয়সে পৌঁছালে তাকে নিয়মিত সালাত আদায়ে অনুরোধ করা হবে, পাশাপাশি নামাজ না পড়ার জন্য সতর্কীকরণও দেওয়া হবে।

এভাবে শিশুর মধ্যে ধীরে ধীরে সালাতের অভ্যাস ও দায়িত্ববোধ গড়ে ওঠে।

ইসলামী আদব-কায়দা

শিশু যখন কিছুটা বড় হয়, তখন তার দীনদার পিতা-মাতা এবং শিক্ষিত মায়েরা তাকে ইসলামী আদব-কায়দার শিক্ষা দিতে শুরু করেন। এতে শিশুকে শেখানো হয় দৈনন্দিন জীবনের ছোট ছোট কাজগুলো কিভাবে ইসলামী নিয়ম অনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, খাওয়া-দাওয়া, পানি পান, হাত মেলানো ইত্যাদি সবসময় ডান হাতে করা, নাক পরিষ্কার করা; পেশাব বা পায়খানার পর পানি ব্যবহার করে পাক-পবিত্র হওয়া; পানি পান করতে বসে এবং সম্ভব হলে তিনটি শ্বাসে পানি নেওয়া; বড়দের সালাম করা; হাঁচি এলে "আল-হামদুলিল্লাহ" বলা; খাওয়ার আগে "বিসমিল্লাহ" বলা এবং খাওয়ার পরে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করা।

এ বয়সেই শিশুকে ছোট ছোট সূরা মুখস্থ করানো হয়, রোজকার দু'আ ও যিকির শেখানো হয়। পাশাপাশি, আল্লাহর নবী-রাসূল ও তাদীয় নেক বান্দাদের জীবনের ঘটনাগুলো শোনানো হয়। এর ফলে শিশুর আকীদা-বিশ্বাস দৃঢ় ও বিশুদ্ধ হয়, ধ্যান-ধারণা সৎ ও সুস্থভাবে গড়ে ওঠে এবং তারা নবী ও সৎ মানুষদের আদর্শ অনুসরণ করতে শেখে।

সাধারণভাবে ১৫ বছর বয়সে শিশুকে সাবালক হিসেবে ধরা হয়। এ সময় তার ওপর সালাত ও সিয়াম ফরয হয়ে যায়, এবং বিশেষ শর্তে হজ ও যাকাতের দায়িত্বও আরোপিত হয়। এই বয়সে হালাল-হারাম, পাপ-পুণ্য ও শাস্তি সম্পর্কে সে সচেতন হয়। ফলে, সে নিজের কাজের জন্য দায়বদ্ধ ও দায়িত্বশীল হয়ে ওঠে, এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে—জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত—আদর্শ মুসলিম জীবনযাপনের জন্য প্রস্তুত হয়।

ইসলামে বিয়ে কেবল সামাজিক অনুষ্ঠান নয়। এটি আল্লাহর নির্দেশিত সুন্নত এবং ইবাদতের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বিয়ে মানবজীবনের একটি মৌলিক প্রয়োজনকে পূর্ণ করার পাশাপাশি ধর্মীয়, নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের শিক্ষা প্রদান করে। এটি দুই ব্যক্তি এবং তাদের পরিবারকে একত্রিত করে, যেখানে প্রেম, দায়িত্ব, শ্রদ্ধা, সহানুভূতি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা হয়। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে বিয়ে কেবল মানসিক বা শারীরিক প্রয়োজনের জন্য নয়, বরং এটি একটি আল্লাহনিয়ন্ত্রিত সম্পর্ক এবং জীবনের একটি পূর্ণাঙ্গ দায়িত্ব।

১. খুতবা এবং বিয়ের উদ্দেশ্য

বিয়ের সময় সাধারণত খুতবা প্রদান করা হয়। খুতবার উদ্দেশ্য হল বিয়ের তাৎপর্য বোঝানো, বর ও কনের দায়িত্ব, অধিকার ও দাম্পত্য জীবনের নৈতিক দিকগুলো তুলে ধরা। খুতবায় কুরআনের আয়াত ও হাদিসের আলোকে শিক্ষা প্রদান করা হয়। উদাহরণস্বরূপ:

সূরা নিসা ৪:১ – মানুষের সৃষ্টি এবং জীবন সঙ্গীর গুরুত্ব; আত্মীয়-সম্পর্কে সতর্ক থাকা।

সূরা আল-হুজরাত ৪৯:১৩ – আল্লাহর কাছে সবচেয়ে মর্যাদাশীল হলো ধার্মিক ও ভদ্র ব্যক্তি।

সূরা আল-আহযাব ৩৩:৭০-৭১ – আল্লাহকে ভয় করা, সঠিক কথা বলা, এবং তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে মহা সাফল্য অর্জন।

খুতবা বর ও কনের মনোযোগকে আল্লাহর দিক নির্দেশনা ও দায়িত্বের প্রতি কেন্দ্রীভূত করে। এতে বিয়ের মাহাত্ম্য শুধুমাত্র সামাজিক বা আনন্দমুখী অনুষ্ঠান হিসেবে না দেখে, বরং আল্লাহর শপথের মাধ্যমে গ্রহণকৃত জীবনযাত্রা ও দায়িত্ব হিসেবে বোঝানো হয়।

২. ইজাব-কবুল এবং খোরমা বিতরণ

খুতবা শেষে বর ও কনের মধ্যে ইজাব-কবুল সম্পন্ন হয়। বর ও কনে আল্লাহর নামে পরস্পরের প্রতি সম্মতি প্রদর্শন করে, যা জীবনব্যাপী প্রতিশ্রুতি ও দায়বদ্ধতার প্রতীক।

এরপর খোরমা বিতরণ করা হয়, যা প্রাচীন সুন্নত এবং ধর্মীয় রীতি হিসেবে পালন করা হয়। এটি শুধুমাত্র অতিথিদের আনন্দ দেয় না, বরং ধর্মীয় ও সামাজিক শিক্ষারও প্রতিফলন ঘটায়।

৩. দাম্পত্য সম্পর্ক: অধিকার ও দায়িত্ব

ইসলামে দাম্পত্য সম্পর্ক কেবল ব্যক্তিগত চাহিদার জন্য নয়; এটি একটি ইবাদতের মর্যাদা বহন করে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক:

পারস্পরিক সম্মান, ভালোবাসা ও সহানুভূতির ভিত্তিতে গঠিত।

স্ত্রী ও সন্তানদের প্রতি কোমলতা, স্নেহ ও ন্যায় বজায় রাখা।

পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্ব পালন।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উদাহরণে দেখা যায়, তিনি স্ত্রী ও সন্তানদের প্রতি সর্বদা ন্যায়পরায়ণ ও স্নেহপূর্ণ ছিলেন। তিনি কখনও তাদের কষ্ট বা অসুবিধা উপেক্ষা করতেন না। এমনকি সালাতের সময় শিশু কাঁদলে তিনি তা সংক্ষিপ্ত করতেন, যাতে পরিবারের সদস্যদের অসুবিধা না হয়।

৪. নবী (সা)-এর সীরাতের শিক্ষা

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের দাম্পত্য জীবন আমাদের জন্য সর্বোত্তম উদাহরণ। তিনি কেবল দাম্পত্য সম্পর্ক নয়, শিশুদের ও পরিবারের প্রতি করুণাময় দৃষ্টি দেখিয়েছেন। তার উদাহরণ অনুসরণ করে, মুসলমানরা:

দাম্পত্য জীবনে ন্যায় ও ইবাদতের সমন্বয় স্থাপন করে।

পারস্পরিক অধিকার ও দায়িত্ব রক্ষা করে।

জীবনের সকল স্তরে আল্লাহর ভীতি ও দায়িত্ববোধ বজায় রাখে।

৫. ইসলামী দৃষ্টিতে বিয়ের মূল উদ্দেশ্য

বিয়ের মাধ্যমে:

1. মানবজাতির প্রাথমিক সৃষ্টির আদর্শ রক্ষা করা হয় (হযরত আদম ও হাওয়া)।

2. পরিবার ও সমাজের স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

3. স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রেম, বন্ধুত্ব ও দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি পায়।

4. ইসলামী নৈতিকতা, শৃঙ্খলা ও পারিবারিক শিক্ষা নিশ্চিত হয়।

বিয়ে কেবল রসম-রেওয়াজের জন্য নয়; বরং এটি এক ধরনের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক প্রার্থনা, যেখানে বর ও কনে আল্লাহর নাম স্মরণ করে পারস্পরিক দায়িত্ব ও অধিকার গ্রহণ করেন। জীবনভর এই প্রতিশ্রুতি তাদের আচরণ ও সিদ্ধান্তকে ন্যায়, সততা এবং ধর্মীয় মূল্যবোধের মধ্যে পরিচালিত করে।

৬. উপসংহার

ইসলামে বিয়ে শুধুমাত্র আনন্দ বা সামাজিক প্রয়োজন মেটানোর বিষয় নয়। এটি একটি পূর্ণাঙ্গ ইবাদত, দায়িত্ব ও নৈতিক শিক্ষা, যা বর ও কনের জীবনকে আল্লাহভীতি, ধর্মনিষ্ঠা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও দায়িত্ববোধের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উদাহরণ অনুসরণ করে মুসলমানরা দাম্পত্য জীবনকে সফল, সৌভাগ্যপূর্ণ এবং বরকতময় করে তুলতে পারে।

ইসলামে মৃত্যু শুধুমাত্র জীবনের শেষ ধাপ নয়, বরং এটি মানবজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা, যা মানুষকে তার জীবনের মূল্য, দায়বোধ ও নৈতিক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে। মুসলিম হিসেবে আমাদের প্রতিনিয়ত মৃত্যুর স্মরণ থাকা উচিত, কারণ মৃত্যু সকলের জন্য অবশ্যম্ভাবী এবং মৃত্যুর পরই ইহকাল থেকে পরকাল, কবর ও পরবর্তী জীবন শুরু হয়।

১. মৃত্যুর স্মরণ: মৃত্যুর বাস্তবতা ও গুরুত্ব

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আমাদের বারবার স্মরণ করিয়েছেন যে, মৃত্যুর কথা মনে রাখা মানুষের জীবনকে সুসংহত ও নৈতিকভাবে দৃঢ় রাখে। একটি সহীহ হাদিসে বলা হয়েছে, "মৃত্যুকে অনেকবার স্মরণ করো, কারণ মৃত্যুর স্মরণ দুনিয়ার আনন্দ ও মায়া হ্রাস করে এবং পরকালীন জীবনের জন্য প্রস্তুত করে।"

মৃত্যুর স্মরণ মানুষকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোতে সচেতন করে:

জীবনকে আল্লাহর ইবাদত ও নৈতিক দায়িত্বের মধ্যে পরিচালনা করা।

অপ্রয়োজনীয় দুনিয়াবী সংযম, অহংকার ও জিনিসপত্রের প্রতি আসক্তি কমানো।

আত্মবিশ্লেষণ ও পুণ্যকার্য বৃদ্ধি করা।

---

২. মৃত্যুর সময় ও আচরণ

মৃত্যুর সময় একজন মুসলিমের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামে বলা হয়েছে যে, মৃত্যুর সময় মানুষের বিশ্বাস, নামায ও কুরআনের প্রতি সঙ্গতি তার পরকালীন অবস্থার জন্য প্রভাবিত করে। মৃত্যুর আগে মুসলিমদের উচিত:

1. ইমান দৃঢ় রাখা: মৃত্যুর সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা।

2. সতর্ক ও সংযমী আচরণ: যাঁরা মৃত্যুপ্রান্তে পৌঁছেছেন, তাদের প্রতি পরিবারের সদস্যদের কোমল ও সহানুভূতিশীল থাকা আবশ্যক।

3. দোয়া ও তাওবা: মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ও পাপমুক্ত হওয়ার চেষ্টা করা।

৩. জানাযার নিয়মাবলী ও মাহাত্ম্য

মৃত্যুর পর মুসলিমদের জন্য জানাযা বা মৃতদেহের শেষকৃত্য ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ রীতি। জানাযা মুসলমানদের জন্য একটি শাস্ত্রীয় ও সামাজিক দায়িত্ব।

দেহ ধোওয়া (গুসল করা): মৃতদেহকে প্রথমে ইসলামিক নিয়ম অনুযায়ী পানি দিয়ে ধোয়া হয়। মেয়েদের জন্য নারীদের দ্বারা এবং পুরুষদের জন্য পুরুষদের দ্বারা ধোয়া হয়।

কাফন করা: দেহকে সাদামাটা কাপড়ে মোড়া হয়, যা সাধারণত সাদা কফন।

জানাযা সালাত: দেহকে কফন করার পর জানাযা সালাত পড়া হয়। এটি একটি কালেক্টিভ প্রার্থনা, যেখানে মুসলিমরা মৃতের জন্য দোয়া করে।

দাফন (মরদেহ সমাধিস্থ করা): মৃতদেহকে কবরস্থলে সমাধিস্থ করা হয়। কবরটি পূর্ব-পশ্চিম দিকে করা হয়, যাতে মৃত ব্যক্তি মুখ কিবলা দিকে থাকে।

মৃতের জন্য দোয়া ও স্মরণ: দাফনের পর মুসলমানরা মৃতের জন্য দোয়া করেন, আল্লাহর কাছে তাঁর পাপ মাফ ও জান্নাতের জন্য প্রার্থনা করেন।

৪. মৃত্যুর পর সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্ব

মৃত্যুর পর পরিবার ও সমাজের দায়িত্বও গুরুত্বপূর্ণ। মুসলমানদের উচিত:

মৃতের মর্যাদা বজায় রাখা, তার সম্পর্কে মিথ্যা বা অযাচিত মন্তব্য না করা।

জানাযা ও দাফন অনুষ্ঠানকে সাধারণ ও শান্তিপূর্ণ রাখা।

মৃতের পরিবারকে সহায়তা ও সান্ত্বনা প্রদান।

মৃতের জন্য দোয়া, যাকাত ও সদকা দিয়ে তার পুণ্য বৃদ্ধি করা।

---

৫. মৃত্যুর শিক্ষা: জীবনের মূল্যায়ন

মৃত্যু মুসলিমদের কাছে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, জীবন ক্ষণস্থায়ী। দুনিয়ার ধন-সম্পদ, ক্ষমতা বা আনন্দ চিরস্থায়ী নয়। তাই মুসলিমদের উচিত:

দৈনন্দিন জীবনকে আল্লাহর ইবাদত, নৈতিকতা ও সামাজিক দায়িত্বের মধ্যে পরিচালনা করা।

মৃত্যুর স্মরণ দ্বারা জীবনকে অর্থবহ ও সদ্যপূর্ণ করা।

পরকালীন জীবনের জন্য প্রস্তুতি নেয়া।

৬. উপসংহার

ইসলামে মৃত্যু ও জানাযা কেবল জীবনের শেষকালের অনুষ্ঠান নয়, বরং এটি মানুষের জন্য শিক্ষা, নৈতিকতা ও দায়িত্ববোধের প্রতিফলন। মৃত্যুর স্মরণ, জানাযা ও দাফন মুসলিম সমাজকে একত্রিত রাখে, মানবিক মূল্যবোধ বজায় রাখে এবং পরকালীন জীবনের প্রতি সচেতনতা জাগিয়ে দেয়। একজন মুসলিমের জীবন, মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত থেকে শুরু করে জানাযা পর্যন্ত সবকিছুই আল্লাহর আনুগত্য, নৈতিকতা ও মানবিক দায়িত্বের মধ্যে পরিচালিত হওয়া উচিত।

ইসলামে মৃতের পরিবারকে সম্মান জানানো এবং তাদের শোকের সময়ে সহানুভূতি প্রকাশ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্ব। যখন কোনো পরিবারের সদস্য মারা যায়, তখন তাদের মানসিক অবস্থা সাধারণত খুবই ভেঙে পড়া ও উদ্বিগ্ন হয়। এই সময়ে রান্না-বান্নার দুশ্চিন্তা, খাবারের ব্যবস্থা করা বা দৈনন্দিন কাজকর্ম পরিচালনা তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে।

এই পরিস্থিতিতে আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু ও প্রতিবেশীদের পক্ষ থেকে খাবার প্রেরণ করা হয়। এটি একটি প্রাচীন সুন্নত যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সময় থেকে মুসলিম সমাজে চলে আসছে। খাবার পাঠানোর মাধ্যমে শোকসন্তপ্ত পরিবারকে মানসিক চাপ ও দৈনন্দিন দায়িত্ব থেকে কিছুটা মুক্তি দেওয়া হয়।

সাধারণভাবে, মৃতের পরিবারের অবস্থান, সমাজের রীতি ও সম্পর্ক অনুযায়ী এই প্রথা তিন ওয়াক্ত বা সর্বোচ্চ তিন দিনের জন্য পালন করা হয়। আত্মীয়-পরিজন ও বন্ধু-বান্ধবরা মিলিতভাবে খাবারের আয়োজন করে এবং সবাই মিলে তা গ্রহণ করে। এর ফলে শোকের সময় পরিবার শুধু শোক প্রকাশে মনোনিবেশ করতে পারে এবং একই সঙ্গে সমাজের অন্যরা তাদের প্রতি সহানুভূতি ও সম্মান প্রদর্শন করতে পারে।

এই রীতি কেবল সামাজিক দায়বোধ নয়, বরং ইসলামিক নৈতিকতারও অংশ। এটি মৃতের মর্যাদা ও পরিবারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এবং শোকের সময় মুসলিম সমাজের আন্তরিক সহানুভূতির প্রকাশ ঘটায়।

৫ম অধ্যায় ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতি

আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ.) কেবল নতুন ধর্ম বা নতুন দীন ইসলামের দাওয়াত দেননি, বরং তারা একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনধারা ও সভ্যতারও প্রবর্তক ছিলেন। এই সভ্যতা কেবল আধ্যাত্মিক বা নৈতিক নির্দেশনায় সীমাবদ্ধ নয়, বরং এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে একটি নতুন জীবন-পদ্ধতি, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নিয়মাবলী, এবং এমন নৈতিক ও চারিত্রিক মানদণ্ড যা সমাজকে সুসংগঠিত ও মানবিক করে তোলে। ইসলামী সভ্যতাকে আমরা রব্বানী বা ঐশী সভ্যতা বলি, কারণ এটি আল্লাহর নিকট থেকে প্রাপ্ত নীতিমালা ও নির্দেশের ভিত্তিতে গঠিত।

ইসলামী সভ্যতার মূল ভিত্তি হল এর ধর্মীয় আকীদা ও বিশ্বাস, ইসলামী জীবনধারার মৌলিক নীতিমালা এবং নৈতিক ও চারিত্রিক বিধানসমূহ। এই মৌলিক উপাদানই মুসলিমদের একক এবং সম্মিলিত পরিচয় বহন করে। বিশ্বের যে কোন প্রান্তে মুসলমান বসবাস করুক না কেন, তার ভাষা, সংস্কৃতি বা পোশাক যাই হোক না কেন, এই মৌলিক নীতিমালা ও বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে তাদের মধ্যে সাযুজ্য এবং ঐক্য লক্ষ্য করা যায়।

এই সাধারণ ও মিলিত উপাদানের কারণে দুনিয়ার সব মুসলিমকে একই পরিবারে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। তারা সর্বত্র একই সভ্যতার ধারক হিসেবে পরিচিত। ইসলামী সভ্যতা কেবল ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক সীমাবদ্ধতায় নয়, বরং সামাজিক, নৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনের বিস্তৃত ক্ষেত্রকে অন্তর্ভুক্ত করে। এটিই ইবরাহীমি সভ্যতার সাথে তুলনায় আরও ব্যাপক ও সমৃদ্ধ অর্থবোধক, কারণ এটি দুনিয়ার যে কোনো মুসলমানের জীবন ও আচরণে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়।

ইবরাহিমী-মুহাম্মদী সভ্যতা

হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আ.) ছিলেন আল্লাহ-পরস্ত সভ্যতার প্রতিষ্ঠাতা ও অগ্রদূত। তিনি এমন একটি সমাজ ও জীবনপদ্ধতির ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, যার মূল স্তম্ভ আল্লাহর একত্ববাদ ও ওয়াহ্দানিয়াত, মানুষের প্রতি সহানুভূতি ও করুণা, সরলতা ও সুস্থিত চরিত্র এবং আল্লাহর প্রতি যথাযথ ভক্তি ও তাওয়া। এই সভ্যতার মূলনীতি মানব জীবনের প্রতিটি

দিককে নিয়ন্ত্রিত ও সুসংগঠিত রাখে, যাতে মানুষ নৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং সামাজিকভাবে সমৃদ্ধ জীবনযাপন করতে পারে।

হযরত ইবরাহীম (আ.) এর আখলাক ও চরিত্রের গুণাবলী এই সভ্যতার মূল রক্তধারায় প্রবিষ্ট। কুরআন মাজিদে তাঁর ব্যাখ্যা করা হয়েছে:

> "ইবরাহীম তো অবশ্যই সহনশীল, কোমল হৃদয়, সতত আল্লাহ অভিমুখী।" (সূরা হুদ: ৭৫) "ইবরাহীম তো কোমল হৃদয় ও সহনশীল।" (সূরা তাওবা: ১১৪)

এই আখলাক ও চরিত্রের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল এমন একটি সভ্যতা যা মানবজাতির জন্য নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক। হযরত ইবরাহীম (আ.) শুধুমাত্র এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন না, বরং তিনি এর আদর্শ ও রীতিমালা স্থির করেছিলেন।

এরপর হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম, যিনি হযরত ইবরাহীম (আ.) এর বংশধর এবং নবী হিসেবে পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছিলেন, এই সভ্যতাকে পুনঃসংস্কার এবং পূর্ণতা প্রদান করেন। তিনি ইবরাহিমী নীতিমালা ও মূলনীতিগুলিকে নতুনভাবে প্রাণবন্ত করেন, এগুলোকে স্থায়ী ও বিশ্বজনীন করে তোলেন। তাঁর নেতৃত্বে এই সভ্যতা কেবল আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে নয়, সামাজিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকেও স্থায়ী ও সর্বজনীন হয়ে ওঠে।

ইবরাহিমী-মুহাম্মদী সভ্যতা তাই কেবল একটি ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক কাঠামো নয়, বরং এটি মানবতার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনধারা, যেখানে নৈতিকতা, আধ্যাত্মিকতা, সামাজিক সহমর্মিতা ও সৌন্দর্যপূর্ণ জীবনযাপনের সুসংগঠিত নির্দেশাবলী একত্রে সমন্বিত হয়েছে।

ইবরাহিম| সভ্যতার তিনটি বৈশিষ্ট্য

ইবরাহীমি সভ্যতার মৌলিক বৈশিষ্ট্য তিনটি: এক, আল্লাহর সত্তায়

নিশ্চিত বিশ্বাস এবং তাঁকে সার্বক্ষণিক হাযির-নাজির জ্ঞান করা। দুই, তাওহীদি আকীদা-বিশ্বাস (যেমন ইবরাহিমী সিলসিলার নবীগণ শিক্ষা দিয়েছেন এবং-এর পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা-

বিশ্লেষণ কুরআন মজীদে পাওয়া যায়)। তিন, শরাফত ও মানবীয় সাম্যের অপরিহার্য স্থায়ী ধারণা যা কোন মুসলমানের মস্তিষ্ক থেকে পৃথক কিংবা বিচ্ছিন্ন হয় না। এগুলোই সেই সব বিশেষ বৈশিষ্ট্য যেসব বৈশিষ্ট্য ইবরাহিমী সভ্যতাকে দুনিয়ার অপরাপর সভ্যতার মুকাবিলায় একটি নতুন রূপ দান করে। এসব বৈশিষ্ট্য এত উজ্জ্বল ও প্রোজ্জ্বলভাবে, আমাদের জানা মতে, আর কোন সভ্যতায় পাওয়া যায় না।

প্রথম বৈশিষ্ট্য: মুসলমানের জীবনে আল্লাহর স্মরণ

মুসলমানদের জীবনে আল্লাহর স্মরণ একটি মৌলিক ও অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্য। আল্লাহর পবিত্র সত্তার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস এবং সার্বক্ষণিকভাবে তাঁকে উপস্থিতি ও সতর্কতাসহ (হাযির-নাজির) মনে রাখা মুসলমানের দৈনন্দিন জীবন, সমাজ ও সভ্যতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে রয়েছে। মুসলমানদের জীবন ও সভ্যতাকে একটি জটিল yet সুসংগঠিত ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায়, যেটিতে নানা স্বাদ, স্থানভিত্তিক বৈচিত্র্য, আবহাওয়া ও সংস্কৃতিগত প্রভাব থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর নাম ও তাঁর স্মরণ সমাজ ও সভ্যতার প্রতিটি স্তরে প্রবাহিত হয়ে থাকে, ঠিক যেন রক্তের স্রোতের মতো।

শিশুর জন্মের সঙ্গে এই অনন্ত প্রথার সূচনা ঘটে। নবজাতকের কানে প্রথম আযান ও একামত বলা হয়। শিশুর সপ্তম দিনে আকীকা অনুষ্ঠিত হয়, এবং তার ইসলামী নামকরণ করা হয়, যেখানে বিশেষভাবে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় এমন নামকে যা আল্লাহর বন্দেগী ও তাঁর ওয়াহ্দানিয়াতের প্রকাশ বহন করে। নামের মাধ্যমে শিশুর পরিচয় আল্লাহর সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয় এবং মুসলিম সমাজের অংশ হিসেবে তার অবস্থান নিশ্চিত করা হয়।

শিশুকে লেখা-পড়া শেখানোর প্রক্রিয়াতেও আল্লাহর নাম ও কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে উদ্বোধন করা হয়। উপমহাদেশে এটি 'তাসমিয়া খানী' বা 'বিসমিল্লাহ খানী' হিসেবে পরিচিত। বিয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ জীবনের মুহূর্তেও আল্লাহর নাম প্রতিশ্রুতির কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে। বিয়ের খুতবার মাধ্যমে নবদম্পতিকে স্মরণ করানো হয়, যে তারা আল্লাহর সম্মান ও আদেশের অধীনে দায়িত্বপূর্ণ জীবনযাপন করবে।

এছাড়া মুসলমানদের জন্য ঈদ ও কুরবানীর উৎসবও আল্লাহর স্মরণকে কেন্দ্র করে আবদ্ধ। ঈদে গোসল, পবিত্র পোশাক পরা, ঈদগাহে সালাত আদায় এবং ঈদুল আযহায় কুরবানী—all কিছুই আল্লাহর নাম ও মহিমাকে প্রাধান্য দেয়।

জীবনের শেষ পর্যায়েও এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে। মৃত্যুর সময় মুসলমানের মুখ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উচ্চারিত হয়: "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন" (আমরা আল্লাহরই জন্য এবং তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করি)। জানাযা ও দাফনের সময় মৃত ব্যক্তিকে আল্লাহর নাম ও পয়গম্বরের মিল্লাত অনুসারে পরিচালনা করা হয়। তার মুখ কা'বার দিকে রাখার মাধ্যমে আল্লাহর কেন্দ্রের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়। মুসলমানদের প্রথা অনুযায়ী, জানাযার সময় ও কবরস্থাপনেও আল্লাহর স্মরণ ও দোয়া অপরিহার্য।

দৈনন্দিন জীবনে আল্লাহর স্মরণ কেবল আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং প্রতিটি কাজের সঙ্গে যুক্ত। খাওয়া-দাওয়া, পানি পান, হাঁচি দেওয়া, সালাম দেওয়া—সবকিছুই আল্লাহর নামের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এটি মুসলিমদের জন্য একটি অভ্যাসের মধ্য দিয়ে আল্লাহর প্রতি সচেতনতা, ধ্যান ও ইয়াকীন (দৃঢ় বিশ্বাস) নিশ্চিত করে।

এই ধারাবাহিকতা ও সচেতনতা মুসলমানদের ব্যক্তিগত জীবনে, পরিবারে এবং সমাজে আল্লাহর উপস্থিতি ও স্মরণকে একটি দৃঢ় ও সমৃদ্ধি-প্রদ অনুষঙ্গ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। এটি মুসলিম সভ্যতার একটি আন্তর্জাতিক ও সম্মিলিত দিক, যা তাদের জীবনধারার প্রতীক এবং প্রতিটি পদক্ষেপে আল্লাহর স্মরণের প্রকাশ ঘটায়।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য: তৌহিদী আকীদা

মুসলিম সভ্যতার অন্যতম মৌলিক ও আন্তর্জাতিক আলামত হলো তৌহিদী আকীদা—একত্ববাদী বিশ্বাস। এটি মুসলিমদের আকীদা-বিশ্বাস থেকে শুরু করে তাদের আমল, কর্ম, ইবাদত-বন্দেগী, অনুষ্ঠানমালা, সামাজিক রীতি এবং দৈনন্দিন জীবন সবক্ষেত্রেই স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়।

মসজিদগুলোতে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত আযান ইসলামের মূল আকীদা-বিশ্বাসকে ঘোষণা করে—"আল্লাহ এক, এবং কেউ আল্লাহর সঙ্গী নয়"। মুসলিমদের জন্য এটি একটি সার্বজনীন নিদর্শন যা সমাজের প্রতিটি স্তরে দৃশ্যমান। বাসস্থান, বসতবাড়ি, কারুকাজ, চিত্রশালা—সব জায়গাই ইসলামের মূল নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। ইসলামী নিয়ম অনুযায়ী, মূর্তিপূজা, শরেক বা যেকোনো প্রকার ভাস্কর্য, প্রাণীর ছবি ইত্যাদি মুসলিমদের বসত বা শিক্ষা ক্ষেত্রে অনুপযুক্ত। এমনকি শিশুদের খেলাধুলার পরিবেশেও এই সীমা অতিক্রম করা যাবে না।

ধর্মীয় অনুষ্ঠান, রাষ্ট্রীয় উৎসব বা রাজনৈতিক নেতার জন্মদিন, পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠান—সবক্ষেত্রে মুসলিমরা এই তৌহিদী সীমার প্রতি সচেতন থাকবে। ছবি বা প্রতিকৃতির সামনে মাথা নত করা, করজোড়ে দাঁড়ানো, পুষ্পমাল্য অর্পণ ইত্যাদি কর্মকাণ্ড ইসলাম ও মুসলিম সভ্যতার মূলনীতির বিপরীত। মুসলিমরা যেখানেই থাকুক, ইসলামী সভ্যতার নৈতিক ভিত্তিকে রক্ষা করতে এগুলো থেকে দূরে থাকবে।

নামকরণ, অনুষ্ঠান বা শপথ গ্রহণের ক্ষেত্রে পুরাতন বুযুর্গ ও গুরুজনদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রেও মুসলিমরা হেজাজী তৌহিদের সীমা অতিক্রম করবে না। অন্য কোনো জাতি বা সম্প্রদায়ের রীতি-প্রথা বা সাংস্কৃতিক অনুকরণ ইসলামের মূল আকীদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। ইসলামী তৌহিদী বিশ্বাসের প্রতি অনুগত থেকে মুসলমানরা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ববাদকে প্রতিষ্ঠিত রাখে এবং সভ্যতার মৌলিক সত্তাকে দৃঢ়ভাবে রক্ষা করে।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য: মানবীয় মর্যাদা ও সাম্যের ধারণা

ইসলামী সভ্যতার তৃতীয় আন্তর্জাতিক প্রতীক হলো মানবীয় মর্যাদা ও সাম্যের ধারণা, যা মুসলিম সমাজের মৌলিক নীতি এবং ইসলামী আচরণবিধির সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত। এটি মানুষের মর্যাদা, সামাজিক সাম্য, এবং সকলের প্রতি সমান দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিফলিত করে। মুসলিম সভ্যতায় এই ধারণা শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে প্রতিফলিত হয়।

এই আকীদা-বিশ্বাসের প্রাকৃতিক ফল হলো যে মুসলিম সমাজে ব্যক্তি কখনোই অন্যের সাথে সামাজিক বা অর্থনৈতিক অবস্থার ভিত্তিতে বৈষম্য করে না। একজন মুসলিম অন্য মুসলিম বা এমনকি অন্য ধর্মের লোকের সঙ্গে অশ্লীল বা অসম্মানজনক আচরণ থেকে দূরে থাকে। সামাজিক মিলন, পারস্পরিক সম্মান এবং একে অপরের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ ইসলামী নৈতিকতার অবিচ্ছেদ্য অংশ।

মুসলিমদের জীবনযাপনে এ বিশ্বাসের বাস্তব উদাহরণ লক্ষ্য করা যায় খাদ্যাভ্যাস, ইবাদত এবং দৈনন্দিন সামাজিক কর্মকাণ্ডে। উদাহরণস্বরূপ, এক মুসলিম অন্যের সঙ্গে একই পাত্র বা থালায় বসে খাবার গ্রহণ করতে দ্বিধা করে না। একে অপরের সঙ্গে খাদ্য ভাগাভাগি করে, প্রয়োজনে অবশিষ্ট খাদ্য গ্রহণ করে এবং পানি বা পানীয়ও ভাগাভাগি করে নেয়। এ ধরনের আচরণ সমাজে সৌহার্দ্য এবং সমতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

নামাযেও এই বৈশিষ্ট্য স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। প্রজা ও রাজা একসাথে কাতারে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করবে। ইমাম যদি সাধারণ মধ্যবিত্ত বা সাধারণ মানুষের মধ্য থেকে হন, তবুও উচ্চবিত্ত, অভিজাত পরিবার বা প্রশাসনিক পদমর্যাদার ব্যক্তিরা তার পেছনে নামায আদায় করে। এটি মুসলিম সমাজে সাম্য এবং পারস্পরিক মর্যাদার এক অনন্য প্রতীক।

সংক্ষেপে, মানবীয় মর্যাদা ও সাম্যের ধারণা ইসলামী সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি মুসলিমদের দৈনন্দিন জীবন, সামাজিক আচরণ, ধর্মীয় অনুশীলন এবং সভ্যতার প্রতিটি স্তরে অঙ্গীভূত। এটি শুধু ধর্মীয় নীতি নয়, বরং সামাজিক সংহতি, সমতার শিক্ষা এবং নৈতিক সংস্কারের প্রতীকও বটে।

ছোটখাটো ও খুটিনাটি বৈশিষ্ট্য

ইবরাহিমী সভ্যতার মৌলিক নীতি ও বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি কিছু ছোটখাটো ও খুটিনাটি রীতিনীতিও মুসলিম সমাজে সর্বত্র দেখা যায়। এগুলো যদিও দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ অভ্যাসের মতো মনে হয়, তবে এগুলো ইসলামের নৈতিক ও শিষ্টাচারের সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত।

উদাহরণস্বরূপ, যে কোনো ভালো কাজ বা শিষ্টাচারিক কাজ করা হয় ডান হাত ব্যবহার করে। যেমন: খাওয়া, পানি পান করা, কাউকে কিছু দেওয়া বা গ্রহণ করা। খাবার গ্রহণের সময় ডান হাতে খাওয়া, পানি পান করার সময় ডান হাত ব্যবহার করা, কাউকে কোন বস্তুর আদান-প্রদান করা হলে তা ডান হাতে করা—এসবই ইসলামী সভ্যতার ছোটখাটো শিষ্টাচারের নিদর্শন।

এ ধরনের ছোটখাটো আচার-আচরণ মুসলমানদের নৈতিক চরিত্র, সতর্কতা এবং ধর্মীয় সুশৃঙ্খলতার পরিচায়ক। এগুলো শুধু ব্যক্তিগত জীবনকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে না, বরং সমাজে শৃঙ্খলা, সৌজন্য এবং সৌহার্দ্যের সংস্কৃতিরও প্রতীক। এভাবে, ইবরাহিমী সভ্যতা কেবল মৌলিক নীতি ও আচার-আচরণেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং এই ধরনের সূক্ষ্ম, দৈনন্দিন শিষ্টাচারের মাধ্যমে প্রতিটি মুসলিমের জীবনের সঙ্গে জড়িত ও জীবন্ত হয়ে থাকে।

মুসলিম সমাজে পেশার অবস্থানগত মর্যাদা

মুসলিম সমাজে কোনো পেশা স্থায়ী মর্যাদা বা চিরন্তন শ্রেণীর প্রতীক নয়। ইসলামে কোনো পেশাকে ঘৃণ্য বা অবজ্ঞেয় হিসেবে দেখা হয় না। একজন মানুষ তার প্রয়োজন, যোগ্যতা ও সুযোগ অনুযায়ী যে কোনো সময় কোনো পেশা গ্রহণ করতে পারে এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পেশা পরিবর্তন করতেও সে সম্পূর্ণ স্বাধীন। এই স্বাধীনতা ইসলামিক সমাজের মূলনীতি, যা মানুষকে সামাজিক বা বৃত্তিগত বঞ্চনা থেকে রক্ষা করে।

মুসলিম সমাজে কোনো গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় পেশার ভিত্তিতে স্থায়ী শ্রেণিবিন্যাস তৈরি করতে পারে না। অতীতে ও বর্তমানেও বিভিন্ন যুগে মানুষ তাদের প্রয়োজন ও সুবিধা অনুযায়ী বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত হয়েছে। এমনকি একই সম্প্রদায়ের ভেতরও পেশার বৈচিত্র্য দেখা যায়। তবে কোনো পেশাকে ধর্মীয় বা সামাজিক মর্যাদার ভিত্তিতে শ্রেষ্ঠ বা তুচ্ছ ধরা হয় না।

ইসলামের কেন্দ্রভূমি, যেমন মক্কা ও মদিনা এবং অন্যান্য আরব অঞ্চলে দেখা যায় যে, কিছু সম্মানিত আলেম বা মুসলমানের নামের সঙ্গে তাদের পেশাগত পরিচয় যুক্ত থাকে। উদাহরণস্বরূপ, হারাম শরীফের ইমাম বা খতীবদের নামের সঙ্গে পদবী যেমন হাল্লাক (নাপিত), যায়্যাত (কলু বা তেলী), সাওয়াফ (ধুনরী), কাসসাব (গোশত বিক্রেতা) ইত্যাদি যুক্ত

থাকে। এই পদবী কোন অবজ্ঞা বা অপমানের প্রতীক নয়, বরং ঐতিহ্য ও পরিচয়ের অংশ হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

ফলে, মুসলিম সমাজে পেশার মর্যাদা কেবল কাজের মান, দায়বদ্ধতা এবং পরিশ্রমের ভিত্তিতে বিবেচিত হয়, সামাজিক বা বংশগত কারণে নয়। এটি মুসলিমদের মধ্যে সাম্য, ন্যায্যতা এবং স্বাধীনতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

বিধবা ও ডিভোর্সি নারীর পুনর্বিবাহ

ইসলামে বিধবা বা ডিভোর্সপ্রাপ্ত নারীর পুনর্বিবাহকে কখনোও দূষণীয় বা সামাজিকভাবে অগ্রহণযোগ্য হিসেবে ধরা হয়নি। এটি নবীর (সা.) সুন্নতের মধ্যে পড়ে। ইতিহাসে দেখা যায়, নবী (সা.) নিজেও বিধবা বা বিধবা প্রাপ্ত নারীকে বিয়ে করার সুপরিচিত উদাহরণ দিয়েছেন। এছাড়া, বিভিন্ন যুগের সম্মানিত আলেম, রাজা ও সমাজের মর্যাদাবান ব্যক্তিরা এই প্রথাকে সম্মানজনক ও নৈতিকভাবে সঠিক মনে করে পালন করেছেন।

বর্তমান সমাজে অনেক ডিভোর্সি বা বিধবা নারী আবার বিবাহের সুযোগ পেলে সামাজিক চাপ, ভিন্নমত বা অবজ্ঞার চোখে পড়ে। অনেক সময় সমাজ তাদেরকে লজ্জার বা অপমানজনক দৃষ্টিতে দেখে, যা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে এটি সম্পূর্ণ বৈধ, নৈতিক এবং প্রশংসনীয়। দ্বিতীয় বিবাহ একটি সুযোগ, যা নারীকে নিরাপত্তা, সামাজিক মর্যাদা ও মানসিক শান্তি দেয়।

প্রয়োজনীয়ভাবে বলা যায়, ডিভোর্সি বা বিধবা নারীও যে কোনো মুসলিম নারী-পুরুষের মতোই ইসলামের বিধি অনুযায়ী স্বাভাবিকভাবে বিবাহের অধিকার রাখে। সমাজের ভুল দৃষ্টিভঙ্গি কিংবা সাংস্কৃতিক বাধার কারণে এই সুযোগকে হীন বা লজ্জার বিষয় মনে করা সঠিক নয়। মুসলিম সমাজে পুনর্বিবাহকে সামাজিক, নৈতিক ও ধর্মীয়ভাবে সম্মানজনক ধারা হিসেবে ধরা হয়।

তাই, একজন ডিভোর্সি নারীকে আবার বিয়ে করার ক্ষেত্রে কখনোই লজ্জা বা অপমানের অনুভূতি থাকা উচিত নয়। এটি তার স্বাভাবিক অধিকার, ইসলামের সুন্নত এবং তার সামাজিক ও মানসিক নিরাপত্তার অংশ।

সুতরাং, সমাজে যে ভুল ধারণা চলে আসছে—ডিভোর্সি বা বিধবা মহিলার পুনর্বিবাহকে অপমানজনক চোখে দেখা—তা ইসলামের নৈতিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। বরং এটিকে উৎসাহিত করা, সমর্থন দেওয়া এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করা উচিত।

সালামের রেওয়াজ ও তার বিভিন্ন প্রকার

ইসলামে সালাম বিনিময় একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও ধর্মীয় আচরণ। এটি শুধু শুভেচ্ছা প্রকাশের মাধ্যম নয়, বরং মুসলিম সমাজে বন্ধুত্ব, সৌহার্দ্য এবং শান্তি স্থাপনের একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়। সাধারণত দেখা-সাক্ষাৎ বা আসা-যাওয়ার সময় মুসলিমরা একে অপরকে সালাম জানায়।

সালাম দেওয়ার সময় বলা হয়:
"আস্সালামু আলাইকুম"
যার অর্থ হলো, "তোমার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।"

সালাম গ্রহণকারীর প্রতিক্রিয়া হয়:
"ওয়া আলাইকুমু স্-সালাম",
অর্থাৎ, "তোমার ওপরও শান্তি বর্ষিত হোক।" এটি ইসলামের একটি স্বীকৃত নিয়ম, যা সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ও সামাজিক বন্ধনকে দৃঢ় করে।

সালামের বিভিন্ন প্রকার

সালাম বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে ও অবস্থায় ব্যবহার করা যায়, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

1. মুখোমুখি দেখা-সাক্ষাতে: যখন দুই মুসলিম একে অপরের সঙ্গে দেখা করে, তখন সরাসরি সালাম বিনিময় করা হয়।

2. চিঠি বা বার্তায় সালাম: চিঠি, ই-মেইল বা মেসেজে শুভেচ্ছার সূচনায় সালাম লেখা হয়।

3. সমবেত বা জমায়েতের সময়: মসজিদ বা অন্যান্য ধর্মীয় সমাবেশে একে অপরকে সালাম দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়।

4. অপরিচিত মুসলিমদের জন্যও সালাম: ইসলামে প্রিয় বা পরিচিত মুসলিমই নয়, অজানা মুসলিমকেও সালাম দেওয়া সুন্নত।

সালামের গুরুত্ব

এটি সামাজিক বন্ধন ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধি করে।

মুসলিম ভাই বা বোনের প্রতি শুভকামনা প্রকাশের একটি মাধ্যম।

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের রাস্তা হিসেবে গণ্য।

সর্বোপরি, সালাম শুধু একটি ভদ্রতা নয়, এটি মুসলিম সমাজে শান্তি ও ঐক্যের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়।

ইসলামে ‘ইলম’ (জ্ঞান)-এর মর্যাদা

ইসলামে জ্ঞান বা ‘ইলম’-কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা মানুষকে জ্ঞানী ও সচেতন করে তোলার জন্য নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বেছে নিয়েছেন। ৬১১ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি, মক্কার নিকটবর্তী হেরা পর্বতের নির্জন গুহায় নবীর ওপর নাযিল হয় ইসলামের প্রথম ওয়াহী, যা সূরা আলাকের আয়াতগুলিতে উল্লেখ আছে:

> اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

(সূরা আলাক: ১-৫)

অর্থাৎ:
"পড়ো, তোমার প্রভু-প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষকে সেঁটে থাকা বস্তু থেকে সৃষ্টি করেছেন। পড়ো, আর তোমার প্রভু মহিমান্বিত, যিনি কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন যা সে পূর্বে জানত না।"

এই আয়াত আমাদের জানান দেয় যে, জ্ঞান অর্জনের যাত্রা সর্বদা আল্লাহর নির্দেশনা এবং প্রভুত্বের স্বীকৃতিতে শুরু হওয়া উচিত। বিশেষত, নবী সা.-এর অবস্থান ছিল উম্মী—অর্থাৎ তিনি লিখতে বা পড়তে জানতেন না। তারপরও আল্লাহর প্রথম আদেশ ছিল 'ইকরা' বা 'পড়ো'। এটি ইসলামের শিক্ষাগত দর্শনের গভীরতা এবং বিপ্লবাত্মক দিককে প্রকাশ করে।

ইলমের গুরুত্ব ও প্রাথমিক নির্দেশ

নবী সা.-এর উম্মী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিত থেকে দেখা যায় যে, ইসলামে জ্ঞান অর্জন কেবল ব্যক্তিগত উন্নতি নয়, বরং এটি উম্মাহর শিক্ষা, উন্নয়ন ও নেতৃত্বের জন্য অপরিহার্য। আল্লাহ বলেন:

> عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

(সূরা আলাক: ৫)
"মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন যা সে পূর্বে জানত না।"

ইসলাম শিখায় যে, জ্ঞান সীমাহীন এবং প্রতিনিয়ত বিস্তৃত হতে পারে। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, মহাশূন্য অন্বেষণ—এগুলি সমস্তই মানুষের জ্ঞানের সীমা প্রসারের উদাহরণ।

কলমের মর্যাদা

আল্লাহ বলেন:

> وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ

(সূরা আলাক: ৪)

এখানে কলমকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। কলম শুধু লেখার একটি যন্ত্র নয়; এটি জ্ঞানের স্রোত, শিক্ষার মাধ্যম এবং মানব সভ্যতার অগ্রগতির প্রতীক। নবী সা.-এর উম্মী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কলমের প্রতি এই গুরুত্ব ইসলামী শিক্ষার মূল ভিত্তি হিসেবে দাঁড়ায়।

হাদিসে ইলমের মর্যাদা

নবী সা. বলেছেন:

> “طلب العلم فريضة على كل مسلم”

(সুনান ইবনে মাজাহ)

অর্থাৎ: “প্রতিটি মুসলিমের ওপর জ্ঞান অর্জন করা ফরজ।”

এছাড়াও, হাদিসে বলা হয়েছে:

> “من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة”

(সহিহ মুসলিম)

অর্থাৎ: “যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের পথে যাত্রা শুরু করে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে পৌঁছানোর পথ সহজ করে দেবেন।”

জ্ঞান, শিক্ষা ও মানবকল্যাণ

ইসলামের শিক্ষার লক্ষ্য কেবল ব্যক্তিগত উপার্জন নয়। জ্ঞান সমাজ ও মানবতার কল্যাণে ব্যবহার করা হবে। জ্ঞান হতে হবে নৈতিক, মানবিক ও ব্যবহারিক। এটি কেবল সাহিত্য, চিত্রকলা বা যেকোনো শখের উদ্দেশ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং জ্ঞান শিক্ষা দেবে—কিভাবে মানব সমাজ উন্নত হবে, কিভাবে দুনিয়ার সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করা যায়, কিভাবে বিজ্ঞানের মাধ্যমে মানুষের জীবনমান বৃদ্ধি করা যায়।

উপসংহার

নবী সা.-এর ওপর নাযিল হওয়া প্রথম ওয়াহী থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইসলামে জ্ঞান অর্জনের যাত্রা আল্লাহর নির্দেশিত পথে হতে হবে। জ্ঞান অর্জনকে সম্মান দেওয়া হয়েছে, কলমের মাধ্যমে শিক্ষাকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, এবং এটি শুধুমাত্র ব্যক্তিগত উন্নতির নয়, সমগ্র মানব সমাজের কল্যাণে ব্যবহার করার নির্দেশনা প্রদান করে।

উপসংহার

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা যা ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করে।
ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির সংযোগ বোঝার মাধ্যমে পরিলক্ষিত হয় যে, ইসলাম ন্যায়, নৈতিকতা, শিক্ষার মূল্য এবং মানব কল্যাণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে।

হালাল-হারাম, তাকওয়া ও রিযক সংক্রান্ত নির্দেশনা আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে সুসংগঠিত ও নৈতিকভাবে পরিচালিত করতে সহায়তা করে।
নারীর মর্যাদা, পারিবারিক দায়িত্ব এবং সমাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী সুন্দরভাবে সমন্বয় করা হয়েছে।

এই গবেষণাপত্রের মাধ্যমে আশা করা যায় যে, ইসলামের মূল নীতিমালা, সামাজিক দায়িত্ব এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাবেন এবং এগুলোর প্রয়োগে প্রেরণা অর্জন করবেন।